দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ১৫ আগস্ট, ২০২২।। ২৯ শ্রাবণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। পনেরই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচার

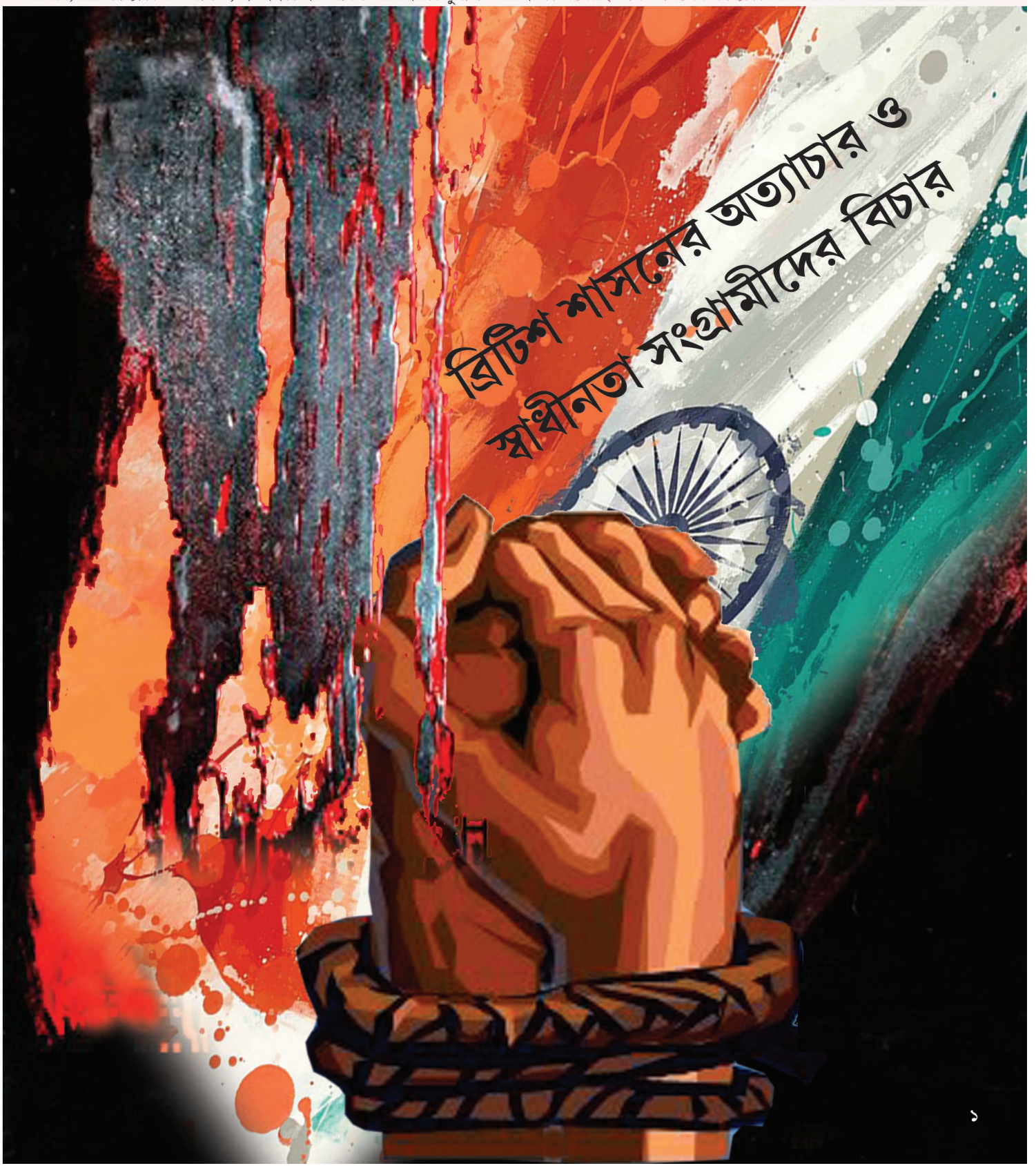

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।

৭৪ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৫ আগস্ট - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

তদন্তের তির মমতার দিকে মোদী বৈঠকে কি তারই ইঙ্গিত? ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দাদা, আমি বাঁচতে চাই ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

কাশ্মীরের মন থেকে মুছে দিতে হবে পাকিস্তানের কল্পনা ☐ রাহুল পণ্ডিত ☐ ৮

তথাকথিত সেটিং তত্ত্ব এবং সিপিএম-কংগ্রেসকে সুবিধে করে দিতে মমতার কৌশল ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ☐ আনন্দমোহন দাস ☐ ১১

লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার ☐ ড. পূরবী রায় ☐ ১৩

শ্রীঅরবিন্দ ও মুরারীপুকুর বোমা মামলা, বিপ্লবী থেকে মহান যোগীতে উত্তরণ ☐ বিনয়ভূষণ দাশ ☐ ১৬

অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে সাধনা করতেন শ্রীঅরবিন্দ ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ১৯

বাঙ্গালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে ডাকটিকিট ☐ ড. কল্যাণ গৌতম ☐ ২৩

সোনার ফুলদানিতে প্লাস্টিকের গোলাপ ☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ২৬

মুক্তি সংগ্রামের অমৃত-দিশা গীতা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অবিলম্বে শুরু করা হোক ☐ শ্রীরাধা ☐ ৩৫

ভারতের নৌবিদ্রোহ এগিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তি ☐ স্বপন দাস ☐ ৩৬

শ্রীহট্টের বিভাজন ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায় ☐ ড. সুজিত ঘোষ ☐ ৩৮

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মতুয়াদের অবদান ☐ রক্তিম দাস ☐ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২২ আগষ্ট ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২২ আগষ্ট ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পঁচাত্তরে স্বস্তিকা

জন্মাষ্টমীতে ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে স্বস্তিকা। জন্মলগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়ার এমন উজ্জ্বল উদাহরণ খুব বেশি নেই। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার জগতে এমন নীরোগ, সুস্থ ও দীর্ঘজীবন বড়ো একটা দেখা যায় না। আগামী সংখ্যায় থাকবে পঁচাত্তর বছর ধরে স্বস্তিকার সুদীর্ঘ যাত্রার গৌরবোজ্জ্বল নানান দিক। লিখবেন নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০/ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০/ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০/ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**
A/C. No. : **0954000100121397**
IFS Code : **PUNB0095400**
Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**
VIVEKANAND ROAD
Kolkata - 700 006

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা পঁচাত্তর

স্বাধীনতার পঁচাত্তরটি বৎসর অতিক্রম করিল ভারত। প্রতি বৎসর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া শুধু জাতীয় সংগীত গাহিয়া আর কিছু সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করিয়াই আমরা আমাদের কর্তব্য সমাধা করিয়া থাকি। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচাত্তরতম বর্ষটি এক অন্য মাত্রা বহন করিতেছে। সেই নিমিত্ত গত এক বৎসর ধরিয়া সারা দেশে পালিত হইয়াছে স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসব। বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগে এই উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হইয়াছে নানান অনুষ্ঠানের। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিতে প্রাণবলিদানকারী বীর যোদ্ধাদের যেমন স্মরণ ও তর্পণ করা হইয়াছে, তেমনই বর্তমান প্রজন্মকে দেশ গড়ার মহতী কাজেও অনুপ্রণিত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কালখণ্ডটি শুধুমাত্র দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসনকাল নহে, পাঠান-মোগলের শাসনকাল লইয়া তাহা দীর্ঘ হাজার বৎসরের—এই সত্যটিও বর্তমান প্রজন্মের সামনে পরিষ্কার করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে বীর বিপ্লবীদের স্মরণ ও তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে মোগল-পাঠানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিন্ধুর রাজা দাহির, দিল্লির পৃথ্বীরাজ চৌহান, চিতোরের রাণাপ্রতাপ সিংহ, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজী, পঞ্জাবের গুরুগোবিন্দ সিংহ, গাণ্ডোয়ানার রানি দুর্গাবতী, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, বঙ্গপ্রদেশের কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, গৌরগোবিন্দ প্রমুখ যাঁহারা স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বরাজ রক্ষার জন্য মরণপণ লড়াই করিয়াছেন, তাঁহাদেরও যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গেই স্মরণ করা হইয়াছে, পঁচাত্তর বৎসরে দেশের স্বাধীনতা কতটুকু পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করানো হইয়াছে, পঁচাত্তর বৎসরে দেশের গণতন্ত্র পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্বসভায় এক সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। দেশ বিভাজনের ক্ষত সামাল দিয়া ১৯৫৬ সালে এশিয়ার প্রথম পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করিয়াছে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ৭টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ২১টি পারমাণবিক চুল্লি স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৯ সালে পথ চলা শুরু করিয়া বর্তমানে মহাকাশ গবেষণায় ভারত যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা অকল্পনীয়। সমগ্র বিশ্ব মহাকাশ গবেষণায় ভারতের সাফল্যকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ইসরোর মঙ্গল মিশন সফল হইয়াছে। মঙ্গলের কক্ষপথে অরবিটার পৌঁছাইয়া ভারত বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ স্থান অর্জন করিয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতীয় রেলের জাতীয়করণ করিয়া বর্তমানে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস এবং দেশের মাউন্টেন রেল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে খেতাব অর্জন করিয়াছে। সবার জন্য শিক্ষার অধিকারের পাশাপাশি শিশুদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে ভারত একাধিক পদক্ষেপ লইয়াছে। বর্তমানে দেশের ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার বিদ্যালয়ে ১২ কোটি শিশুকে একবেলার খাদ্য প্রদান করিতেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে গৌরবময় পদচারণা শুরু করিয়াছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও খেলনাশিল্পে আত্মনির্ভর হইয়াছে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসরে ভারত রাষ্ট্রজীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার জয়যাত্রা শুরু করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষেই বর্তমানে ভারত স্ব-তন্ত্রতার পথে অগ্রসর হইতে শুরু করিয়াছে। হাজার বৎসরের পরাধীনতার ফলস্বরূপ যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা হইতে ভারতবাসী মুক্তিলাভ করিতে মন ও মানসিকতায় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দেশের পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে, ভারতের এই জয়যাত্রা অনেকেই মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। যেমন তাহারা মানিয়া লইতে পরিতেছেন না বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নকে। যে কোনো অজুহাত সৃষ্টি করিয়া পদে পদে তাহারা ভারতকে বিশ্বের সম্মুখে অপদস্থ করিবার চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছে। ভারতের এই নবজাগরণ শত্রুদেশ যেমন সহ্য করিতে পারিতেছে না, তেমনই দেশেরই দাসসুলভ মানসিকতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গও মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। সুখের বিষয়, দেশবাসী তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং করিতেছে।। আশা করা যাইতেছে, স্বাধীনতার শতবর্ষে সমগ্র ভারত স্বাভিমানসম্পন্ন হইয়া বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে। পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস তাহারই সংকল্প গ্রহণের দিন।

সুভাষিতম্

দানায় লক্ষ্মীঃ সুকৃতায় বিদ্যা চিন্তা পরং ব্রহ্মবিনিশ্চায়।

পরোপকারায় বচাংসি যস্য ধন্যস্ত্রিলোকীতিলকঃ স এব।

যিনি দান করার জন্য ধন সংগ্রহ করেন, ভালো কাজের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করেন, সর্বদা ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তন করেন, পরোপকারের জন্য কথা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ধন্য। তিনি ত্রিলোকীনাথেরও তিলকস্বরূপ।

তদন্তের তির মমতার দিকে
মোদী বৈঠক কি তারই ইঙ্গিত?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজনৈতিক মহলের ধারণা সোনিয়া আর রাহুল গান্ধীকে জেরা করা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ যাবেন কেন? তাঁদের দু'জনকে পঞ্চাশ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়েছে। মমতার দলের কিছু নেতা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। সে দায় অবশ্যই মমতার উপর বর্তায়। আস্ফালন আর হুমকি দিয়ে তা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না মমতা। জনমানসে সে বিচার অবশ্যম্ভাবী। নজিরবিহীন দুর্নীতির যে মিসাইল আর বোমা তৃণমূল ছুঁড়েছে তার জবাবদিহি তাঁকেই করতে হবে। জনস্মৃতিকে দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী ভেবে কোনোভাবেই পার পাওয়া যাবে না। মানুষের দরবারে হিসেব দিতেই হবে।

এখন অবধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত বা দুর্নীতির তথ্য হাজির করা যায়নি। কেবল পরোক্ষ অভিযোগ তোলা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত দলের দুর্নীতিপরায়ণ দঙ্গলের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছেন মমতা। এই অবস্থা কতদিন বজায় থাকবে তা নিয়ে আমার সংশয় রয়েছে। অবশ্য বিরোধীরা রাজনৈতিকভাবে তাঁকে দুর্নীতির রানি বলেই ডাকেন। পিঠ বাঁচাতে দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা যে মমতাকে ফাঁসিয়ে দেবেন না তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

মমতার চিন্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। একটি আর্থিক লেন-দেনের সাক্ষী হিসেবে তাঁকে ইতিমধ্যেই জেরা করা হয়েছে। মমতা বিলক্ষণ জানেন ঘরে ভাঙন ধরলে সামলানো দুষ্কর। দলের অনেকটা রাশ এখন অভিষেকের হাতে। মমতা প্রশাসন চালালেও তাতে অভিষেকের ইচ্ছা আর অভিমত থাকে। তাই বাবুল সুপ্রিয় বিধায়ক হয়েই মন্ত্রী হলেন আর দলের ৬৪ জন নতুন বিধায়ক সাইডলাইনে বসে রইলেন। বাবুল অবশ্য কেন্দ্রের খুচরো মন্ত্রী ছিলেন। অবস্থার বিচারে তাই মমতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের এক লক্ষ কোটি টাকার দাবি যে চল্লিশ মিনিটের ব্যক্তিগত বৈঠকে মেটানো অসম্ভব তা সকলেই জানেন। তাহলে কী নিয়ে আলোচনা? কেনই-বা নীরব মমতা?

এমন হতেই পারে মমতা হয়তো আন্দাজ করেছেন এবার তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। সে তদন্ত যাতে পক্ষপাত দুষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতেই হয়তো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন মমতা। তেমনই হয়তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জোর করে তিনি কোনো তদন্ত আটকাবেন না। এ সবই সূত্র মারফত শোনা। বৈঠকের আনুষ্ঠানিক বিষয় আর যে দীর্ঘ সময় ধরে দু'জনের মধ্যে বৈঠক হয়েছে তার মধ্যে আমি সাযুজ্য পাইনি। আমার মনে হয়েছে রাজ্যের আর্থিক দাবি ভিন্ন সেখানে আরও কিছু আলোচিত হয়েছে যা জনসমক্ষে বলার নয় আর তাই হয়তো নিশ্চুপ মমতা।

> “বৃদ্ধ নেতাদের অনেকেই জড়িয়ে রয়েছেন বিভিন্ন দুর্নীতির জালে। আর মমতা ভাবছেন কীভাবে এদের ঘাড় থেকে নামাবেন। নামাতে চাইলেই চেপে বসছে। বাঘের পিঠে চেপে ঘুরছেন মমতা। জানেন না কবে নামতে পারবেন।”

আগের অনেক বৈঠকের মতো মোদী-মমতার এই বৈঠকটিও তাই রহস্যে মোড়া। নীরব থেকে মমতা তাকে আরও রহস্যপূর্ণ করেছেন। আমার অবশ্য মনে হয়নি এই বৈঠক থেকে মমতা আর বিজেপির মধ্যে নতুন করে কোনো সমীকরণ তৈরি হয়েছে। বাতিল হয়ে যাওয়া কিছু বিজেপি নেতা মমতা আর প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠক নিয়ে অহেতুক ঠোঁট ফুলিয়েছেন। অথচ তাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই।

দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সিপিএম আর কংগ্রেস এই সেটিং তত্ত্বেই আপাতত মশগুল রয়েছে। তৃণমূলের আটজন জাতীয় নেতার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে তদন্ত চলছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। গ্রেপ্তারি মেমোতে 'নিকট আত্মীয়' বলে মমতাকে তিনি ভীষণ ফাঁপরে ফেলেছেন। অনেকের ধারণ এটা পার্থবাবুর ইচ্ছাকৃত। দলের মধ্যে একজনের উপর রাগ পার্থবাবু অন্যভাবে ফলিয়েছেন। তবে জেলে থেকেও পার্থবাবু মমতা বিরোধী কোনো মন্তব্য করেননি। পার্থবাবুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করে তাঁর মতোই দল থেকে দু'সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড হয়েছেন এক খুচরো মুখপাত্র। এখন খুচরো নেতাদের সামনে রাখা ছাড়া তৃণমূলের কোনো উপায় নেই। বৃদ্ধ নেতাদের অনেকেই জড়িয়ে রয়েছেন বিভিন্ন দুর্নীতির জালে। আর মমতা ভাবছেন কীভাবে এদের ঘাড় থেকে নামাবেন। নামাতে চাইলেই চেপে বসছে। বাঘের পিঠে চেপে ঘুরছেন মমতা। জানেন না কবে নামতে পারবেন। □

দাদা, আমি বাঁচতে চাই...

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলেযু,

না, আমি সম্বোধনে নামটা লিখব না। ভয় পাচ্ছি না মোটেও। আসলে করুণা হচ্ছে। গোটা দেশে একঘরে হয়ে যাওয়া, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া একটা মানুষকে চিঠি লেখা খুব কষ্টের জেনেও লিখছি। আপনার পাশে দাঁড়াতেই এই লেখা।

পার্থ জেলে। অর্পিতা দলের কেউ নয় বললেও লোকে বিশ্বাস করছে না। কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ছবি বাঙ্গলার মানুষ ভুলতে পারছে না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে দিয়ে নিজেদের বলে দাবি করার দিনও চলে গিয়েছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব নাম বদলাতে হবে। কেন্দ্র বেনিয়মে টাকা দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় আবার ১৯ জন ভাই-বোনের নাম উঠে এল। এর মধ্যে দুই দাদা প্রয়াত। কিন্তু তাতেও কি ছাড় পাওয়া যাবে! কে জানে?

বাঙ্গলার নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে, তা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (ইডি) খতিয়ে দেখুক এমন নির্দেশ দেওয়ার কোনও মানে হয়! আর্জি জানানো হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় আদালত এককথায় রাজি হয়ে ইডিকেও জুড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিল। এখন তো মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা।

একেবারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে থেকে এসেছে নির্দেশ। বিজেপিকে গালও দেওয়া যাবে না। ১৯ জন নেতা-মন্ত্রীর একটি তালিকা-সহ তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিসেব জমা দিয়ে বলা হয়েছে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। পাঁচ বছরে সম্পত্তি কীভাবে এত বাড়ল, তা খতিয়ে দেখুক ইডি। এর প্রেক্ষিতে ইডিকে ওই মামলায় একটি পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বেঞ্চ। মানে সোজা কথা হলো এবার সবার হিসেব খতিয়ে দেখবে ইডি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কত সাপ যে বেরিয়ে আসবে সেটা ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে।

বিপদের সময়ে নতুন উটকো ঝামেলা। কোনও মানে হয়! সত্যিই আপনার 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' অবস্থা চলছে। সাবধানে থাকবেন। শান্ত থাকবেন। বেশি টেনশন করে লাভ নেই।

আদালতে যে ১৯ জন নেতা-মন্ত্রীর সম্পত্তি খতিয়ে দেখার আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারী, তাঁদের সবাই শাসক দল তৃণমূলেরই মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতা। কেউ কেউ প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁরা হলেন ফিরহাদ হাকিম, ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক, শিউলি সাহা, অমিত মিত্র, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং ভাটপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন সিংহের নামও রয়েছে। রয়েছে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও। এঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার এঁদের স্ত্রীরা তেমন ভাবে কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের সম্পত্তি পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫০ শতাংশের বেশি।

রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে ২০১৭ সালে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল আদালতে। সেই মামলার সূত্রেই আদালতে নতুন করে এই আর্জি জানিয়েছেন আইনজীবী শামিম। তাঁর দেওয়া তালিকায় আর যেসব নেতা-মন্ত্রীদের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন, গৌতম দেব, ইকবাল আহমেদ, স্বর্ণকমল সাহা, অরূপ রায়, জাভেদ আহমেদ খান, আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী দত্ত। এখন বিপদের সময়ে নতুন উটকো ঝামেলা। কোনও মানে হয়!

সত্যিই আপনার 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' অবস্থা চলছে। সাবধানে থাকবেন। শান্ত থাকবেন। বেশি টেনশন করে লাভ নেই। □

অতিথি কলম

রাহুল পণ্ডিত

কাশ্মীরের মন থেকে মুছে দিতে হবে পাকিস্তানের কল্পনা

আজকের কাশ্মীরে ঘটে চলা প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। সেখানকার প্রত্যেকটি যুবক যারা তথাকথিত আজাদির পক্ষে বন্দুক ওঠাবার কথা ভাবছে বা হাতে নিয়ে ফেলেছে তারা কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের শ্যেনচক্ষুর নিরীক্ষণের মধ্যে রয়েছে। হ্যাঁ, নিরাপত্তা বাহিনী এই অস্ত্র ওঠানোর মানে জানে আর এও জানে অস্ত্র ব্যবহারের মধ্যবর্তী সময়েই তাদের হাতে এই তথাকথিত বিপ্লববাদীর মৃত্যু হবে। ২০১৬ সালের পর কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তাই এই প্রথম তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমনকী গত বছরেও যে গুরুত্বপূর্ণ শ্রীনগর জেলা যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল তাও এখন প্রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে।

একটু পিছিয়ে গিয়ে ভাবলে মনে পড়বে আজকে দুর্লভ হয়ে পড়া নিত্যদিনের কিছু দৃশ্য। খবরের কাগজ বা টিভির পর্দায় সন্ত্রাসীদের শবযাত্রা নিয়ে হাজার হাজার কাশ্মীরির উত্তাল ভারত বিরোধী মিছিল। ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদী, বিপ্লবী, জিহাদি যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, সেই নরসংহারকারীদের সমর্থনে প্রকাশ্যে জনতার ভয়ধরানো উল্লাস আজ কাশ্মীর থেকে মুছে গেছে।

এই সূত্রে আজ একটা বিষয় আমাদের ভীষণভাবে মাথায় রাখতে হবে যে, যখন বিচ্ছিন্নতাবাদীর সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটছে যার ফলশ্রুতিতে সে হয়তো মারা যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিণতির আগের পৃষ্ঠভূমি অর্থাৎ সেই সন্ত্রাসবাদীটির গতিবিধির খবর পুলিশকে পৌঁছে দিচ্ছে একজন কাশ্মীরবাসী শান্তিপ্রিয় নাগরিক। যা এক সময় অচিন্তনীয় ছিল।

এই Counter insuregency বা প্রতি বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড এখনও ১০০ শতাংশ সফল করা যায়নি। তা না হলে পুলওয়ামার মতো বড়ো ক্ষতি ঘটে যেত না। সেই খবরটা সময়মতো আমাদের গোপন সূত্র জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ৩৭০ ধারা বিলোপের তিন বছর পর একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ একেবারে অঞ্চল ধরে ধরে হিসেব করলেও আজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তিন বছর ধরে গড়ে তোলা ব্যবস্থার ওপর দিল্লিকে আরও কয়েকটি কাজ করতেই হবে। আজকের কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থকদের মধ্যে সর্বদা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার একটা ভয় কাজ করছে। সন্ত্রাসী সমর্থক পরিবারগুলি যে কোনো মুহূর্তে বাড়ি ঘর বাজেয়াপ্ত হওয়া বা যারা সরকারি চাকরি করছেন তাদের মধ্যে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার আতঙ্ক ক্রিয়াশীল। এটি সেই detterent বা নিরোধকের ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যের গভীর অন্তঃস্থলে পৌঁছে যাওয়া সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সমবেদনা এতদিনে যে একটি পূর্ণ সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে তার আমূল

> সন্ত্রাসবাদী জিইয়ে রাখতে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রক্ষা করতে দিল্লি যদি এতকাল লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারে, এই পুরাতন ও নতুন যে কণ্ঠগুলি নির্ভয়ে ভারতের তিরঙ্গা ওড়াচ্ছে বিপরীত পরিবেশে কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই ভারতের হয়ে নিরস্ত্র সংগ্রাম করছে, তাদের জীবনের প্রতি আর একটু সম্মান দেখানো প্রয়োজন।

উৎপাটন এখনও বাকি। সরকার সবটা শেষ করতে পারেনি।

এই সূত্রে পুলিশবাহিনীর যে কোনো স্থানীয় অফিসারের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে মৌল্লাবাদী 'জামাত-ই-ইসলামি'দের সাধারণ প্রশাসনের ওপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এখনও পুরোদস্তুর নির্মূল হয়নি। সিস্টেমের মধ্যে থেকেই তারা অন্তর্ঘাত চালাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে এখনও খবর পাঠানোর সূত্র সেই পরিমাণ সক্রিয় হতে পারেনি। যাতে জামাতের লোকজন প্রশাসনের মধ্যে থেকেই তাদের ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে উপত্যকার সন্ত্রাসীদের কাছে আগেভাগেই সাবধান হয়ে যাওয়ার খবর পাঠাতে ব্যর্থ হয়। এদের শেষ ব্যক্তি অবধি উৎপাটিত না হলে কাশ্মীরে 'সন্ত্রাস খতম অভিযান' পূর্ণ সফলতা পেতে পারে না।

উগ্রবাদ দমন ছাড়াও প্রশাসনকে এখন আন্তরিক প্রয়াস নিতে হবে পারিবারিক হিংসা, যৌন হয়রানি, মাদক ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাধিগুলি নিরসনের ওপর। এই বিষয়গুলি কাশ্মীরি সমাজকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কল্যাণকর প্রশাসনকে আরও জনমুখী ও নজরে পড়ার মতো কাজ করতে গেলে বিষয়গুলিকে বৃহত্তর ধাঁচার (প্রশাসনিক) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সন্ত্রাস দমনের মতো এই কাজগুলিও সার্বিক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে।

এখন নজর করলেই দেখা যায় সরকার কাশ্মীরে নতুন রাজনৈতিক স্বর নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামিক জিহাদ বা উগ্রবাদের নিন্দা করছে, কেউ-বা হিন্দুদের উপস্থিতিতে একেবারে বাতিল করা মন্দির ধ্বংসের প্রসঙ্গ তুলছে। একজন প্রবীণ কাশ্মীরি আমলা বললেন, এগুলি 'individual sideshows'. যে যার মতো ব্যক্তিগত প্রয়াস।

একজন কেউ মতামত প্রকাশ করলে কোনো সংবাদমাধ্যম হয়তো সেটা কিছুটা প্রকাশ্যে আনল। অন্য কারোর মতামত হয়তো অন্য কোনো মহলে এই ধরনের মান্যতা পেল। গত তিন দশক ধরে ভারতের স্বপক্ষে উদারবাদী মতবাদ অবশ্যই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু মত প্রকাশের পর এদের পরিণতিটা কী হতে পারে, সে দায় কেউ নেয়নি। তাদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এই সন্ত্রাসবিরোধী কণ্ঠস্বর নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও জারি রেখেছিলেন। তাঁদের ক্ষীণ আশা ছিল কখনো দিন বদলালে তারা হয়তো ন্যূনতম রাজনৈতিক মর্যাদা এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত সুবিধেগুলি পেতে পারেন। এদের কিন্তু সরকারকে যে কোনো মূল্যে নিরাপত্তা দিতে হবে। সন্ত্রাসবাদী জিইয়ে রাখতে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রক্ষা করতে দিল্লি যদি এতকাল লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারে, এই পুরাতন ও নতুন যে কণ্ঠগুলি নির্ভয়ে ভারতের তিরঙ্গা ওড়াচ্ছে বিপরীত পরিবেশে কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই ভারতের হয়ে নিরস্ত্র সংগ্রাম করছে, তাদের জীবনের প্রতি আর একটু সম্মান দেখানো প্রয়োজন।

এখন গোড়াতে বলা প্রতি বিদ্রোহের তত্ত্ব নিয়ে একটু কথা বলা যাক। অবশ্যই সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করতে হবে, তবে তাদের সংখ্যাটা যেন ঊর্ধ্বমুখী না হয়। বিশেষ বিশেষ এলাকায় উগ্রবাদ চরমে উঠেছে সেখানে তাদের সন্ত্রাসও প্রবল। কিন্তু নতুন যারা সন্ত্রাসবাদীদের খাতায় নাম লেখাচ্ছে তারা তো পোড় খাওয়া নয়, তাদের কোনো হাতে কলমে খুন করার প্রশিক্ষণের নেই। তাদের পচে যাওয়ার আগেই সংস্কার করার, ঠিক পথ ধরার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। বেশ কিছু প্রবীণ অফিসারের বয়ানে জেনেছি যে বহু পরিবার কোনো উপায়ান্তর না দেখে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। একজন ঢুকলে অন্য পরিবার ভাবে ওরাই বোধহয় ঠিক রাস্তা ধরল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদ রুখতে প্রতিবিদ্রোহের তত্ত্ব কাজে লাগানো সহজ হয়ে আসছে। যেখানে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এনকাউন্টার হয় যেখানে সাধারণ নাগরিক সচরাচর কোনো সংঘর্ষে বাধা দেয় না। গত তিন বছর ধরে এটাই রীতি হয়েছে। আজকের সামরিক বা নিরাপত্তা বাহিনী নতুন প্রযুক্তিগত শক্তিতে বলীয়ান। আকাশে ড্রোন উড়ছে। উপদ্রুত এলাকাগুলি নজরবন্দি। সন্ত্রাসবাদী ধরতে বা প্রয়োজনে নিকেশ করতে এগুলি খুবই উপযোগী। ড্রোন থেকে যদি দেখা যায় কোনো তরুণ উগ্রবাদী যে এখনও নরহত্যায় যোগ দেয়নি সেক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠানগত কৌশল প্রয়োগ করে তার 'ঘর ওয়াপসি' করার সুযোগ থাকে। এতে কিছুটা সময় বেশি লাগতে পারে কিন্তু এটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব। সরকার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিষয়টিতে এখনও তেমনভাবে হাত দেয়নি। কিন্তু তাঁর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাশ্মীরে হিন্দু ঐতিহ্যের অতীতকে রক্ষা করা। কিছু কিছু মন্দিরের পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। অজস্র নিদর্শন ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বেওরা অঞ্চলের এক তরুণ আমাকে সম্প্রতি বৈরাম পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত দুটি মন্দির সম্পূর্ণ vanish করে দেওয়ার প্রমাণ দেখিয়েছে। ইতিহাসে কাশ্মীরে হিন্দু অস্তিত্বের বিষয়টি নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখা আছে। এবার তাদের সে ইতিহাস জানার সময় হয়েছে।

কিন্তু এ বিষয়ে শেষ যে প্রস্তাবনাটি দেওয়ার আছে তাহলো কাশ্মীরি মনোভূমি থেকে পাকিস্তানের কল্পনাটি বিলোপ করিয়ে দেওয়া। তবে আমার মতে এটা তখনই করা সম্ভব যখন আমরা আমাদের মূলধারার রাজনীতি থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে রাখব না। নতুন স্বর নিয়ে আসতে হবে যারা চার দিক থেকে সন্ত্রাসবাদী ইকোসিস্টেমকে ঘিরে ধরবে। কিন্তু তাদের অ্যাজেন্ডায় পাকিস্তানের কোনো উল্লেখ থাকবে না। পাকিস্তানের নাম ভুলিয়ে দিতে হবে। □

শোক সংবাদ

বহরমপুর নগরের খাগড়া প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক শ্রী অমল চন্দ্র গত ২৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

তথাকথিত সেটিং তত্ত্ব এবং সিপিএম-কংগ্রেসকে রাজনৈতিক সুবিধা করে দিতে মমতার কৌশল

আগের সংখ্যায় এই কলমে আলোচনাকালে আমরা বলেছিলাম যে ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পরে তার পরবর্তী এক-দু বছরের মধ্যে সিপিএমের যে করুণ অবস্থা হয়েছিল, গোটা রাজ্য যেভাবে প্রশাসনহীনতায় ডুবে গিয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি, ক্রিকেটীয় পরিভাষায় বলতে গেলে আকশ্যান রিপ্লে হচ্ছে বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে। রাজ্যে শাসকদলের মধ্যে যে মুষলপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে, তার একাধিক নজির দেখা যাচ্ছে। দলের মহাসচিব, এক অর্থে মমতা ব্যানার্জি-অভিষেক ব্যানার্জির পরেই হিসেব মতো যাঁর স্থান, মমতা মন্ত্রীসভায় যিনি নম্বর টু তিনি গ্রেপ্তার হতেই ক্রমাগত তাঁর দলীয় সতীর্থরা তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগে চলেছেন। যেমন মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ ইত্যাদি। এটা তৃণমূলের 'একটাই পোস্ট, বাকিসব ল্যাম্পপোস্ট' তত্ত্বকেই সমর্থন করছে। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি ছাড়া দলে আর কারোরই, তা তিনি সেক্রেটারি জেনারেল হলেও, কোনো সম্মান নেই, দীর্ঘদিন পদে থাকলেও দলে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পার্থর বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য দল অবশ্য কুণাল ঘোষকে সেন্সার করেছে।

এখানেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জির প্রচ্ছন্ন মদত না থাকলে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপত্রের হিম্মত ছিল না দলের সদ্য প্রাক্তন মহাসচিবের বিরুদ্ধে মুখ খোলার। বিশেষ করে, দলীয় সমীকরণে তিনি যেখানে দলের 'সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকে'র ঘনিষ্ঠবৃত্তের লোক বলে পরিচিত। এবং একথা আমাদের সকলেরই জানা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে ইদানিং পার্থ চ্যাটার্জি-ফিরহাদ হাকিম দলের কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, অভিষেক ব্যানার্জির সৌজন্যে এবং তারা পরস্পরের প্রতি সমব্যথীও ছিলেন এবং এর প্রমাণও মিলেছে মমতা মন্ত্রীসভার একমাত্র ব্যতিক্রমী সদস্য হিসেবে ফিরহাদ হাকিমই পার্থ চ্যাটার্জির পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদতেই যদি কুণাল মুখ খুলে থাকেন পার্থের বিরুদ্ধে, তবে দল তাঁকে সেন্সর করলো কেন? এটা কি শুধুই লোকদেখানো। কিছুটা লোক দেখানো ব্যাপার তো আছেই, তার চাইতেও বড়ো হলো কুণাল পার্থকে আক্রমণ করতে গিয়ে যেভাবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে এনে মুখ খুলছিলেন, তাতে সারদায় সবচেয়ে সুবিদাভোগীর নাম যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরই, তা ফের প্রকাশ্যে আসার আশঙ্কায় দলের এই পদক্ষেপ। এবং রাজ্যরাজনীতির এটাই এখন সবচেয়ে বড়ো সত্য, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধরা পড়ার পরে সাংবাদিকদের সামনে যে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আওড়েছেন ও তাতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ঘনিষ্ঠ দলীয় মুখপত্র এই ষড়যন্ত্রের থিওরিকে যেভাবে নস্যাৎ করতে ব্যাগ্র, সেই সঙ্গে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের দিকে নজর দিলে ষড়যন্ত্রকারীকে, তা বুঝতে আর বাকি থাকে না।

পাঠকের মনে থাকতে পারে, গত পঞ্চায়েত ভোটে নারকীয় সন্ত্রাসের পর লোকসভা ভোটে তৃণমূল মুখ থুবড়ে পড়ার পরবর্তীতে দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন অভিষেক। সেই চিত্রনাট্যের অংশ হিসেবে খোদ দলের একদা মহাসচিবকে আজ দলের সঙ্গে বিযুক্ত করা, এসএসকেএমে কয়লা পাচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভর্তি না নেওয়া, দলে শুদ্ধিকরণের অঙ্গ হিসেবে মন্ত্রীসভায় রদবদল, নদীয়া জেলা বৈঠকে দুই অভিযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য ও তাপস সাহা-কে আমন্ত্রণ না জানানো, এমন নানা কাণ্ড অভিষেক করছেন। কিন্তু ন্যাড়া বারবার বেলতলায় যাবে না।

এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে, উপর্যুপরি মমতা-মোদীর বৈঠক কি সেটিং? নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর যে কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের ডাক দিয়েছিলেন, তাতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। (১) পরিবারতন্ত্রের অবসান, (২) দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন, (৩) তোষণ-নীতির অবসান।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রীতিতে এটাই দস্তুর। কিন্তু প্রশ্ন ওঠার সুযোগ থাকছে, কেননা মমতা ব্যানার্জি এই ফেডারেল স্ট্রাকচারকে কোনোকালেই পাত্তা দেননি। আজ এই সময় দিলে মানুষের মনে কুটপ্রশ্ন তো জাগবেই।

সচেতনভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশ্ন জাগাতে পারেন। কারণ জনগণের মনে বিজেপি সম্বন্ধে বিশ্বাসের ভিত টললে আখেরে রাজনৈতিক লাভ হবে তৃণমূলেরই। কারণ রাজ্য থেকে মুছে যাওয়া কংগ্রেস-সিপিএম-কে দিয়ে কিছুটা বিরোধী পরিসর বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে না আনতে পারলে তাঁর গদি রক্ষা করাই যে মুশকিল হবে এটা মমতা বিলক্ষণ জানেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, তৃণমূল জমানায় ইতিপূর্বে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা সিপিএম, কংগ্রেসের মতো বিজেপি 'সেটিং বিরোধী' নয়, প্রকৃত বিরোধী। আর মুখ্যমন্ত্রী এটা জানেন বলেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন।

মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, একথা সবাই জানেন। এবং নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসি চিন্তন মুক্ত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এরকম বিশ্বাসযোগ্যতাহীন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যে বিন্দুমাত্র আপস করবেন না, এটা মমতা ভালোই বোঝেন। তাঁর মতো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর মতো দৃঢ়চেতা ব্যক্তি কোনোদিন আপসে যেতে পারেন না, এটা মমতা জানেন বলেই নিজের রাজনৈতিক সুবিধার্থে সিপিএম-কংগ্রেসের সুবিধা করে দিতেই তথাকথিত সেটিং-এর জল্পনাকে উসকে দিতে চাইছেন তিনি।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আনন্দমোহন দাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৫টি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পথে। আজ আমরা স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করছি। এই সময়ে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠছে। রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে না গিয়ে আজ জোর দিয়ে বলা যায় স্বাধীনোত্তর কালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। বিতর্ক থাকতে পারে আরও অধিক সাফল্য লাভের, বিভিন্ন দলের শাসনের ইতিহাসে কম-বেশি আর্থিক সাফল্য, অন্য দেশের তুলনায় কম সাফল্য কিন্তু একটি জায়গায় সকলেই একমত হবেন যে বিগত ৭৫ বছরে ভারতবর্ষ বিশ্বে এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি শক্তিশালী দেশ। বলাবাহুল্য, সেটি আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

প্রথমেই বলা যায়, বহু শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক বিদেশি শাসনে চক্রান্ত করে ভারতবর্ষকে শিল্পবিহীন করার যে অপপ্রয়াস হয়েছিল, তার ফলে স্বাধীনতার সময়ে দেশের শিল্পের অবস্থা খুব সঙ্গীন ছিল। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও সেই সময় দেশ সামাজিক ও আর্থিক মাপকাঠিতে অনেক পিছিয়ে ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটি ব্রিটিশের চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। আজকের দিনে যা অতি প্রয়োজনীয় এমন বেশ কিছু জিনিস সাধারণভাবে আমাদের নাগালের মধ্যে, ১৯৫০ সালে সেই সময় মানুষের কাছে সেগুলি বিলাসদ্রব্যসম ছিল, কারণ প্রায় সবকিছু জিনিসই তখন আমাদের আমদানি করতে হতো। তার ফলে অনেক কিছু পাওয়ার ক্ষেত্রে ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। কিন্তু আজকের দিনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সবই আমাদের নাগালের মধ্যে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর তুলনামূলকভাবে দেশ যে আজ অনেক মজবুত জায়গায় রয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ কিছু আর্থিক মাপদণ্ড তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মাথাপিছু জাতীয় আয় :

১৯৫০ সালে যেখানে মাথপিছু নিট জাতীয় আয় ছিল ২৬৫ টাকা, আজকের দিনে (২০২০-২১) তা ১৫০৩২৬ টাকা। প্রায় ৫০০ গুণ বেড়েছে গত ৭০ বছরে। সুতরাং কত শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। বলাবাহুল্য, পরিসংখ্যানে জনসংখ্যার নিরিখে জিডিপির আনুপাতিক হারে মাথাপিছু জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যানগত তথ্য ঠিক থাকলেও বাস্তবে হয়তো কিছু পার্থক্য থাকবে, কারণ আমাদের দেশের ১০ শতাংশ লোকের কাছে ২০ শতাংশের বেশি জাতীয় সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে। তবে পরিসংখ্যানগত তথ্য নিয়ে বিতর্ক বা বাস্তবের সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও একথা অবশ্যই বলা যায় স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারতের অর্থনীতি এক মজবুত জায়গায় অবস্থান করছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৫০ সালে ফিলিপসের একটি রেফ্রিজারেটরের দাম ছিল ১৬০০ টাকা যা আয় করতে সাধারণভাবে জনগণের তখন ৫-৮ বছর সময় লাগতো কিন্তু আজকের দিনে সেই স্ট্যান্ডার্ড রেফ্রিজারেটরের দাম মোটামুটি ১০ হাজার টাকায় কেনার জন্য আয় করতে মাত্র ২৪ দিন লাগতে পারে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপ ভাবে ১৯৫০ সালে একটি টুথপেস্টের টিউবের (৫০০ গ্রাম) দাম ছিল ১১ টাকা। তখন এই টাকা আয় করতে ১৫ দিন সময় লাগতো আর এখন ৫০০ গ্রাম টুথপেস্টের দাম ২২৭ টাকা, আয় করতে সময় লাগে মাত্র একদিন।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত এখন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এমন জায়গায় রয়েছে যাকে বাদ দিয়ে বিশ্বে আজ কোনো রকম আলোচনা সম্ভব নয়।

বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ১৯৫০ সালের থেকে অনেক বেশি পরিণত ও উন্নত।

শেয়ার বাজার :

বিশ্বায়নের যুগে আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গত ৪০ বছরে শেয়ার বাজারের সেনসেক্স ৬ জুন তারিখ ৫৫৬৭৫ পয়েন্ট পৌঁছে গেছে যা ১৯৭৯ সালে ছিল মাত্র ১২৪ পয়েন্ট। সুতারং বিদেশি ও দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগে সেনসেক্সে বৃদ্ধি হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

উদ্বৃত্ত খাদ্যভাণ্ডার ও রপ্তানি :

১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাঙ্গলায় খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রকোপে তখনকার দিনে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো এবং দেশ বিভক্ত হয়ে গেল। সেই সময় সকলের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো তদানীন্তন সরকারের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। গরিব মানুষের কাছে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটানোই কঠিন ছিল। বেশিরভাগ খাদ্যশস্য আমদানি করা ছাড়া জনগণের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিল না। আমরা সেই পিএল ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার গম পাঠানোর কথা এখানে স্মরণ করতে পারি। তথ্যসূত্রে জানা যায় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন খাদ্যশস্যের নিট আমদনিকারক দেশ হিসেবে ভারত চিহ্নিত ছিল। মূলত বিভিন্ন

সময়ে কয়েকটি সরকারি পদক্ষেপের ফলে ভারত আজ খাদ্যশস্যে নিট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশ আজ উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানিতে সক্ষম যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরিচায়ক, যেমন কিছু দেশ আমাদের গম রপ্তানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই উন্নয়নের পিছনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো, কৃষি-সবুজ বিপ্লব, আকাশের দিকে না তাকিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষ, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে উন্নত প্রথায় চাষ, ফলন বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের বীজ প্রদান, কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ দিতে কৃষকদের উৎসাহ ভাতা প্রদান, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৫১ সালে ভারতের খাদ্যশস্যে নিট আমদানি ছিল ৪.৮ মিলিয়ন টন, কিন্তু পরিবর্তে ২০২০ সালে দেশের নিট রপ্তানি ছিল ৫.৯ মিলিয়ন টন। সুতরাং বিশ্বে ভারত এখন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক এক দেশ। আরও উল্লেখ করা যায়, ১৯৫৯ সালে দুধের উৎপাদন ছিল ১৭ মিলিয়ন টন যেটি ২০১৯-২০ সালে দাঁড়িয়েছে ১৯৮.৪০ মিলিয়ন টনে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১৮৩২ মিলিয়ন ডিম উৎপাদন ছিল কিন্তু ২০১৯-২০-তে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪৩৮৩ মিলিয়নে। মাছের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালে ৭৫২০০০ টন মাছ উৎপাদন হতো কিন্তু ২০১৯-২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টনে। পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় ১৯৫১ ও ২০২০ সালে দৈনন্দিন মাথাপিছু খাদ্যশস্য উপলব্ধ ছিল নিম্নরূপ :

১৯৫১ সাল :

১. চাল ১৫৯ গ্রাম।

২. গম ৬৬ গ্রাম।

২০২০ সাল :

১. চাল ২০১ গ্রাম।

২. গম ১৭৮ গ্রাম।

সুতরাং ভারত যে আজ খাদ্যশস্যে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ এই তথ্য। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য, ডাল উৎপাদনে ভারতকে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে কারণ ভারতকে এখনও ডাল আমদানি করতে হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য :

তথ্য অনুযায়ী ১৯৬০ সালে বিশ্ব বাণিজ্যর পরিমাণ ছিল জিডিপির ১১.৩ শতাংশ। ২০২০ সালে তা দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৩৭.৯ শতাংশ।

বিমান, রেল ও সড়কপথ :

১৯৫০ সালে দেশে সর্বত্র রেলপথ না থাকলেও রেলই ছিল তখন দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের মূল মাধ্যম। কারণ তখন সড়ক বা বিমানপথের এতো উন্নতি হয়নি। সেজন্য ওই সময় রেলযাত্রীর বেশিরভাগই ছিল শহরতলীর বাইরের লোক। কিন্তু আজ রেল যাত্রীর অর্ধাংশই হলো শহরতলীর প্যাসেঞ্জার, কারণ দেশের শহরতলী-সহ দূরপাল্লার যাত্রায় রেলপথের প্রভূত উন্নতি। এমনকী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম জায়গা-সহ কাশ্মীরেও রেল পৌঁছে গেছে। দুরবর্তী জায়গায় যাওয়ার জন্য আজ আমরা হাইওয়ে বা বিমানপথও ব্যবহার করে থাকি, কারণ এই সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তুলনামূলকভাবে দেখা যায় ১৯৫০ সালে জাতীয় সড়কের পরিমাণ ছিল মাত্র ২০ হাজার কিলোমিটার যা আজ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬০০০ কিলোমিটার হয়েছে। সুতরাং কী পরিমাণ সড়ক বৃদ্ধি হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। আর একটি দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ১৯৫০ সালে পঞ্জীকৃত গাড়ির সংখ্যা ছিল কেবলমাত্র ৩০ লক্ষে, কিন্তু আজ সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি। এগুলিও সড়ক উন্নয়নের পরিচায়ক। গাড়ি শিল্পের উন্নয়নও পরিলক্ষিত হয়। বিমান ক্ষেত্রে ১৯৯০ সাল থেকে দ্রুত উন্নয়ন শুরু হয় এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে বিমান যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ, আজ (২০১৮-১৯) তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ। আরও বিশদভাবে বলা যায়, পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে দৈনিক ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার, ২০১৯-২০ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ। কারণ হলো রেলপথের বিপুল সম্প্রসারণ। ১৯৫০-৫১ সালে রানিং ট্রাক ছিল ৫৯৩১৫ কিলোমিটার যা ২০১৯-২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৯২৩৫ কিলোমিটার।

জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য ও সাক্ষরতা :

যে কোনও দেশের গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্য আসে যখন জনগণের শিক্ষার হার বেশি হয়। ১৯৫১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৮.৩ শতাংশ। তার ফলে সেই সময় দেশের গণতন্ত্র অনেকটাই চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল। বিভিন্ন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭৭.৭ শতাংশে। প্রায় ৪ গুণের উপর বৃদ্ধি হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫০-৫৫ সালে মহিলাপিছু শিশুর জন্মের হার ছিল প্রায় ৬ জন যা ২০২০-২১ সালে দাঁড়িয়েছে ২ জন। আর্থিক অবস্থা-সহ স্বাস্থ্য ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি হওয়ায় শিশু মৃত্যুর হার ১৯৫০-৫৫ সাল যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ১৮১ জন ছিল তা ২০২০-২৫ সালে মাত্র ২৭ জনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫০-৫৫ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৭ বছর যা ২০২০-২৫ সালে ৭০ বছরে পৌঁছে গেছে।

এর পিছনে রয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি। ভারত আগামীদিনে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দু' বছরের কোভিড মহামারি সত্ত্বেও অর্থনীতির বহু মাইলস্টোন পেরিয়ে দেশ ২০২১ সালে ৩.১৮ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির জায়গায় পৌঁছে গেছে। সুতরাং ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হলে ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ আর্থিক দেশের অন্যতম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই জোর দিয়ে বলা যায়, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ছেড়ে যাওয়ার পর ভারত নিজ প্রয়াসে আজ এক মজবুত আর্থিক অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত এখন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এমন জায়গায় রয়েছে যাকে বাদ দিয়ে বিশ্বে আজ কোনো রকম আলোচনাই যে সম্ভব নয় তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। □

লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার

পূরবী রায়

'এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে, না রাখে
কাহারো ঋণ—
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর এসেছে সে এক
দিন।'

'বন্দিবীর'-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। নিজ জন্মভূমি আজ তাদের বিচার ভূমি কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে অপেক্ষারত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আজাদ হিন্দ ফৌজ আইএনএ-র সামরিক ঘাঁটির (ছাউনি) বন্দি-ফৌজিদের বিচারের জন্য জাহাজে, বিমানে ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লির লালকেল্লার বিচার মঞ্চে তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে! তাঁদের অপরাধ--- রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। রাষ্ট্রদ্রোহিতা— হত্যা— নির্যাতন!

নিস্তব্ধ নিথর সন্ধ্যা। ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানদের ভারতেই বিচারের জন্য নিয়ে চলেছে, অথচ কোথাও কোনো উদ্বেগ নেই। আজাদ হিন্দের সৈন্যদের মনে জেগে উঠছে একটা প্রশ্ন, আমাদের বিদায়ী যন্ত্রণার সঙ্গী হবে এমন কেউ নেই— এ কি সম্ভব? পরদিন প্রভাতের আলোয় পট পরিবর্তন হয়ে বিশ্বাসঘাতকের দল হয়ে উঠল 'Hero'— নেতা... the label of 'traitor changed to Hero'! লালকেল্লার তারের বেড়াজাল ভেদ করে গভীর কণ্ঠ নিনাদে ভেসে এল 'জয় হিন্দ'...।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর--- ব্রিটিশ বুঝেছিল যে ২৫ হাজার শত্রুর বিচার বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই বেছে নিল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিন প্রধানকে। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো--- শাহ্ নাওয়াজ খান, মুসলমান, প্রেম কুমার সাহগল, হিন্দু এবং গুরু বক্সসিংহ ধীলন, শিখ। ধীলনের বিরুদ্ধে সরাসরি খুন করার অভিযোগ। অন্য দুজন ধীলনের মদতদাতা। অতএব রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনজনকেই চিহ্নিত করা হলো বিচার ব্যবস্থায়। এই তিন সেনাপ্রধানকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রকাশ্যে বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রিটিশ চরম ভুল করেছিল। বিশেষত সামরিক পক্ষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিন প্রধানকে চিহ্নিত করায় বিপদ আরও ঘনীভূত হলো। আই.এন.এ-র বিচার প্রথমদিকে সেইভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু ব্রিটিশের এই সিদ্ধান্তে বিচার ব্যবস্থার প্রভাব জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগল না। ফলে বিরাট জনস্রোতের মাঝে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাই সরকার তাদের অনতিকালের মধ্যে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া রাজবন্দিদের অর্থাৎ Political Prisoner-দেরও নাম বন্দি ও বিচারের খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল। গণ-আন্দোলনের ফলে INA-এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অফিসার পদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের এবং সামগ্রিক ভাবে রাজবন্দিদের বিচারের প্রয়োজন বাতিল হয়। রাজবন্দিদের অন্তর্ভুক্ত করা ব্রিটিশের অপর আর এক ভুল পদক্ষেপ। জনগণের রুখে দাঁড়ানোয়, ছাত্র, যুব ও সমাজের বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই আন্দোলন জনসাধারণের প্রভূত সাহায্যে এক বিরাট ব্রিটিশ বিরোধী যজ্ঞে পরিণত হয়। দেশব্যাপী যে ক্ষোভ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল তার চরিত্র ছিল রাজনৈতিক।

The Hindustan Times

LARGEST CIRCULATION IN NORTHERN, NORTH-WESTERN & CENTRAL INDIA

DELHI EDITION

NEW DELHI: TUESDAY, NOVEMBER 6, 1945

PRICE 11 ANNAS

I.N.A. TRIAL OPENS IN RED FORT

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে বীর সেনারা নিজেদের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছেন আর তাঁদের বিচার করছে বিদেশি ইংরেজ শাসকরা! সমস্ত বিষয় ও পরিবেশটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দেশপ্রেম, শৌর্য ও আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ প্রতীকে পরিণত হয়। 'নেতাজী জিন্দাবাদ', 'চলো দিল্লি', 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে দেশ তখন মুখরিত— এক অবর্ণনীয় প্রতিক্রিয়া। একথা স্বীকার করতেই হবে যে আজাদ হিন্দের সৈনিকদল আপন মাতৃভূমিতে তাদের প্রত্যাবর্তন যুদ্ধবন্দি হিসেবে, অথচ তারাই জাতির উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার প্রয়াসে পরাধীন রূপে প্রবেশ কিন্তু স্বাধীন জাতির সম্মানে সম্মানিত— এ এক বিরাট সম্মান, এ এক বিরাট জয়!

পরিস্থিতি যখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছালো তখন INA এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেবার সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো— INA এবং রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হোক।

অতএব ১৯৪৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি Central legislative Assembly-র তরফে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে Governor-General-in-Council -কে অবহিত করা হলো যে INA ও রাজবন্দিদের বিচারের জন্য আটকে রাখা যাবে না— মুক্তি দিতে হবে। সারা ভারতে জনসাধারণের আন্দোলনে, দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত আহ্বানে Governor-General-in- Council-কে INA ও রাজবন্দিদের বিচার স্থগিত করতে হলো এবং অবিলম্বে INA রাজবন্দি ও সংযুক্ত অন্যান্য সকলকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য এই প্রস্তাব পেশ করেন ও বক্তব্য রাখেন— যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে যুদ্ধ করেছেন, আজ সত্যিই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁদের বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁদের মুক্তির জন্য উত্তাল ভারতবাসী উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন— এইরূপ প্রতীক্ষা, আকাঙ্ক্ষা এবং এই প্রকার অভিজ্ঞতা পূর্বে কোনো ভারতবাসীর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়নি। অতএব তাদের আশু মুক্তির প্রস্তাব রেখে আমি সেই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সকলের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, সরকারের এই নীরবতা আমরা আর কত সহ্য করব? —ভারতবাসীর মনে এই বিচার এক বিরাট আঘাত হেনেছে, সহ্যের পরিসীমা অতিক্রম করায় জনগণ উদ্বেলিত। আইএনএ-র প্রতি তাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও সপ্রশংস সাধুবাদ আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সুতরাং আর দেরি না করে তাঁদের মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ গৃহীত হোক।

মালব্যের বক্তব্যের সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন এম. আসফ আলি। তিনি বলেন, শুধুমাত্র যাঁরা ভারতবর্ষের আন্দোলনকারী তাদের কথা ভাবলে চলবে না, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে বহু ভারতীয় বিপ্লবী এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তাদেরও মুক্তির দাবি করছি। একই নিয়মে এই দুই প্রকার বিপ্লবীদের মুক্তির আবেদন প্রস্তাব যেন গৃহীত হয়। তাঁর বক্তব্যে : '...Government has come to the concluscon that all these INA personnel will be released sooner or later, I want them to be released sooner than later।

সমর্থন করেছেন কর্নেল কুমার হিম্মত সিংহ। তাঁর মতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় দু' দলই নীতিবাক্যের প্রয়োগ করছেন— forgive and forget। আগামী সেই দিনটির আর দেরি নেই যখন ভারত ও ব্রিটেন একই মঞ্চে অবতরণ করবে। সুতরাং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের শুরু হোক। রাজনৈতিক বন্দিদের একদিকে মুক্তি দেওয়া হবে আর অপরদিকে রাজনৈতিক কারণে বন্দি করে রাখা হবে, এই পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থা কি খুব শোভনীয়? মুক্তি সকল অপরাধীদের জন্য--- আইএনএ-ও রাজবন্দি। Such generous action will be befitting British Statesmanship and will be in line with past British history।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছিলেন শশাঙ্ক শেখর সান্যাল। তিনি বলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনো গল্প নয়, আজাদ হিন্দ ইতিহাসের পাতা। এই ধর্মযুদ্ধে একদিকে সামরিক ও অপরদিকে অসামরিক নির্বিশেষে আইএনএ-তে যুক্ত হন। ভারতীয় সৈন্যরা যখন ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন তখন ব্রিটিশরা তাদের হাতে অস্ত্র দূরস্থান, সামান্য একটা ছড়িও তুলে দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। প্রকৃতভাবে যদি কারুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যায় আমি মনে করি তা করতে হবে সবার আগে ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধে, যারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁদের প্রতি এই অবমাননা ও অবহেলা আজ এই বিচারের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তারই বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তাল জনগণের হুংকার— বিচার বন্ধ হোক, তাদের উপযুক্ত উপহারে অলংকৃত করে মুক্তি দেওয়া হোক। 'And if anything could and should have been done in respect of these brave Indians they ought to have been given the highest honour that our country could have given'।

নেতাজীর দাদা শরৎ বসু আইএনএ-এর প্রশংসা করে, আইএনএ অফিসার ও অন্যান্য এসএনএ-র সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রাচীন প্রথায় আগ্রাসন সহ্য করার দিন আর নেই। দেশ জুড়ে ডাক এসেছে— উঠে দাঁড়াও। দেশকে ২০০ বছরের আগ্রাসন থেকে মুক্ত কর! পরিশেষে তিনি War Secretary সামরিক ব্যবস্থায় ঐতিহ্যপূর্ণ কর্মপন্থার উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্তগুলি ব্যালটে যথাযথ সংখ্যায় না পাওয়ার দরুন List of Business-এ স্থান করে নিতে অক্ষম হয়।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ একবছর বাদে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে Central legislature-এ খান আবদুল গনিখান খানের আইএনএ ফৌজিদের মুক্তির দাবিতে, সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'This Assembly recommends to the Governor General-in-Council to release the Indian National Army Prisoners immediately.'

প্রস্তাব পেশ করে বক্তব্য রেখেছিলেন

খান আবদুল গনিখান। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, আইএনএ-র ফৌজিদের বন্দি করার কারণ তাঁরা সুভাষচন্দ্রের Liberation Army-তে যোগদান করেছিলেন কিন্তু তিনি হয়তো অবগত নন যে প্রকৃতক্ষেত্রে ওই কারণটি আসল বা প্রকৃত কারণ নয়, আসল কারণ হলো— they are accused of brutality, of a crime aganist humanity। দেখা যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ— রাজদ্রোহী থেকে তারা পরিণত হয়েছেন সকল মানুষের বিরুদ্ধে ভয়ংকর হিংস্র আক্রমণের অপরাধীতে যাতে এই অপরাধের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ জনগণের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশের সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এক গুচ্ছ সৈনিক অপর সৈনিকদের হিংস্র কর্মকাণ্ডের অপরাধের বিচার করছেন। আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে : আল্-আমালি বিন-নিয়াৎ'— উদ্দেশ্য দেখেই কার্য বিচার করা যায়। রাজ উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করে সবাই শুধু বল— অবিলম্বে মুক্তি চাই!

এই আলোচনায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন, আর বক্তব্য পেশ করেন পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মা। এই আলোচনা ও বিতর্ক চলাকালীন মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করে নেহরু তাঁর নানা মন্তব্য উপস্থাপন করতে লাগলেন। সকলের নিশ্চয় স্মরণে আছে, এই বিচারে অভিযুক্ত কর্নেল শাহ নাওয়াজ খান, কর্নেল ধীলন ও সাহগাল যখন বেকসুর মুক্তি পান, তখন দেশের জনগণ আবেগতাড়িত ও উদ্বেল হয়ে ওঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের তরফে যারা এই বিচারে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে সুযোগ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং আদালতের সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন মি. ভুলাভাই দেশাইয়ের বক্তব্য পেশের ভূমিকা, সর্বশেষ যার নাম উল্লেখযোগ্য সেই হৃদয়বান পুরুষটি Lord Auchinleck-এর মতামতও নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।

আইএনএ বন্দিদের মুক্তি দাবি করলেও নেহরু তাঁদের সম্পর্কে বিপথচালিত মানুষ (misguided men) বলে মন্তব্য করতেন। তিনি প্রায়শই আইএনএ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগে বলতেন 'তাঁদের ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও' (whatever error and mistakes they had committed) মন্তব্য জুড়ে দিতে ভুলতেন না।

অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রকাশ করতেন যে তাঁর মতে এই আন্দোলন যথার্থ আন্দোলন হিসেবে সমর্থন করা যায় না। কারণ প্রচুর ভুলভ্রান্তি পূর্ণ এই আন্দোলনকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে অপারগ। অথচ জাতীয় কংগ্রেস আজাদ হিন্দ আন্দোলনের জনপ্রিয়তাকে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দেওয়ার প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

জওহরলাল প্রথমে নেতাজীর মত ও পথের বিরোধিতা করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ্য জনসভায় স্বীকারও করেছিলেন। আইএনএ আন্দোলন সম্বন্ধে এক ধরনের মানসিক বাধা ও দ্বৈতভাব সব সময়ই তাঁর ভিতরে কাজ করে চলেছিল। অথচ অপরদিকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। অপরদিকে তিনি কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। একদিকে যেমন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ছিল অপরদিকে অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রতি কোনো উৎসাহ দেখাননি।

নেজাতীর ধ্যান জ্ঞান ছিল দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করা। সুতরাং যেখানে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ছিল নেতাজীর মূলমন্ত্র। লালকেল্লার আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার নেতাজীকে জনসাধারণের মনের সিংহাসনে এমন করে স্থান করে দিয়েছিল যে তিনি ভারতবর্ষের সামরিক শৌর্য-বীর্য, পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ও গর্বের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

অথচ নেহরুভিয়ান বা নেহরু ভক্তের দল তাদের বহু লেখার মাধ্যমে নানা হীন মন্তব্য করে এই সৈনিকদের সম্বন্ধে নানা মিথ্যা প্রচার চালিয়েছেন। সমকক্ষ নেতাদের মধ্যে কুমন্তব্য, দলবাজি ইত্যাদি একে অপরের চরিত্র হনন, তাঁদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কুমন্তব্য— এসবই সর্বকালে সর্বদেশের অলংকার। কিন্তু আইএনএ-র বিচার, তাঁদের দেশপ্রেম— এটি পৃথিবীর সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ। সে সম্পর্কে এখনও অবধি প্রকৃত গবেষণা, কাগজপত্র সংগ্রহ এসব কিছুই বিগত ৭৫ বছর ধরে সামরিক বিভাগ প্রচেষ্টা চালায়নি অথবা প্রতিবন্ধকতার দরুন করতে পারেননি।

Roger Beaumant তাঁর 'The Hidden Truth' বইয়ে লিখছেন : Indian writers such as Nirad Chaudhuri lambasted the British for the weakness shown during the event. (অর্থাৎ trial)। But then Chaudhuri is not a man who shows any sympathy for the INA. He saw the soldiers as 'opportunistic' and referred to them as 'dirty military prostitutes'. লেখক লিখছেন তাঁর মতো বহু লেখক ভারতীয় ও বিদেশি এইরূপ মনোভাব পোষণ করেন; লেখকের মতে এইরূপ মনোভাব ও কুৎসিত মন্তব্য পোষণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার কারণ এইসব ব্যক্তিরা সমরিক জগতের কিরূপ শিক্ষা ও আচরণ সম্পর্কে অজ্ঞাত। কারণ তাঁরা কোনোদিনই সামরিক বাহিনীতে ছিলেন না। এই কুৎসিত আক্রমণের আরও একটি কারণ আইএনএ সংক্রান্ত বহু নথিপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং সত্যকে গোপন করে অপপ্রচারের পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল সুযোগ সন্ধানীদের কাছে।

বিগত ৭৫ বছরের লুকিয়ে রাখা ইতিহাস আজ আস্তে আস্তে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চলছে। আশা রাখি, আগামী দিনে ক্লাসিফায়েড নথি, দলিল ইত্যাদি সামরিক বিভাগের নানা তথ্য মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করা হবে এবং যা গবেষকদের নতুন আলোকে গবেষণা করতে সাহায্য করবে।

'In this mortal world everything perish– but ideas, ideals and dreams do not look ahead. March forward freedom is yours.' □

শ্রীঅরবিন্দ ও মুরারীপুকুর বোমা মামলা
বিপ্লবী থেকে মহান যোগীতে উত্তরণ

মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অরবিন্দের মুক্তিলাভ পৃথিবীর বিচার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দুটি কারণে। প্রথমত, এর প্রধান অভিযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিরোধী নেতা এবং ভাবীকালের বিশ্বের সর্ববরেণ্য 'যোগী' শ্রীঅরবিন্দ। দ্বিতীয়ত, বিনা অর্থে অথচ প্রচণ্ড ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যে এই তরুণ অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই সময়ের তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ।

বিনয়ভূষণ দাশ

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কার্জন কৃত বঙ্গভঙ্গ বঙ্গপ্রদেশ তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। কার্জনের এই বঙ্গভঙ্গের ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী, আবেদন-নিবেদন নীতিতে পরিবর্তন আসে। বাঙ্গলার একদল স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেসের এই আবেদন-নিবেদন নীতি পরিহার করে গুপ্তপথে, সশস্ত্র পন্থায় বিদেশি ইংরেজ শাসকদের বিতাড়নের নীতিতে আস্থাবান হয়ে উঠল। তাঁরা গুপ্ত সমিতি গঠন করে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা এবং ভারতের সর্বত্র স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়। বাঙ্গলার সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই আন্দোলন চলাকালেই কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে এই বিভাজন তীব্র আকার ধারণ করে এবং দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯০৫ সাল থেকে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের দ্বারা কংগ্রেসের নতুন মতবাদের ওপর আঘাত পড়ল। জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রাম নিষ্ঠার অভাবে জাতির কাছে কংগ্রেস অকেজো ও অসার হয়ে পড়ছে— বিপ্লবপন্থীরা এই ঘোষণা করতে লাগল। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো— 'আমরা চাই ব্রিটিশ প্রভুত্ব বর্জিত স্বাধীনতা; কোনো শাসন সংস্কার নয়।' তাঁদের এই নীতিতে সর্বতোভাবে আস্থাবান ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি তাদের এই সংকল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

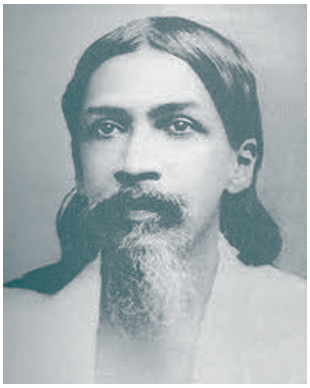

ফলে এই ধরনের পটভূমিতে বাঙ্গলায় নানান গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। বস্তুত, ভারতের নবজাগরণের ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা এই সমিতিগুলি গড়ে তুলেছিলেন। এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হলো অনুশীলন সমিতি। এই অনুশীলন সমিতি গড়ে তুলেছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। বাঙ্গালির দুর্বলতার অপবাদ ঘুচিয়ে, বাঙ্গালিকে শক্তিশালী করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মার্চ, বাংলা১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র সোমবার কলকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন। হেদুয়ার কাছে ২১, মদন মিত্র লেনে সমিতির আখড়া এবং কাছেই একটি বাড়িতে কার্যালয় ছিল। পরে ১৯০৫ সালে কার্যালয়টি ৪৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে এই সমিতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ভারত অনুশীলন সমিতি।' পরে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র নামটি সংক্ষিপ্ত করে 'অনুশীলন সমিতি' করেন। এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যই গীতাপাঠ করতেন। সমিতির অধিবেশনে সমবেতভাবে উচ্চারণ করা হতো শ্রীশ্রীচণ্ডী মন্ত্র —' ইত্থং যদা যদা হি বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামি

অরিসংক্ষয়ম্।।' এই সংগঠনের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), সখারাম গণেশ দেউস্কর, কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ বিপ্লবী যুক্ত হলেন। একটা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯০৬ সালে বরোদা থেকে বাঙ্গলায় ফিরে অরবিন্দ ঘোষও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে। তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী একই উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্বপ্রকারের ট্রেনিং তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের অ্যামালগমেট করিতে হইবে। সতীশচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'আমরা রাজি হইলাম। এই সময়ে উভয় দলের মিল হইয়া গেল। তাহার ফলে যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) ও অরবিন্দ ঘোষ। কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে অরবিন্দ ঘোষ বাঙ্গলার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। এর আগেই অবশ্য পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল। বরোদায় থাকাকালীন তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে এবং সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পক্ষে প্রবন্ধাদি লিখতেন। ১৯০২ সালে তিনিই তাঁর সহোদর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং তাঁকে পাঠিয়ে দেন কলকাতায়। বারীন্দ্র কলকাতায় এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুবকদের নিযুক্তির জন্য কলকাতাকে কেন্দ্র করেন। ১৯০৭ সালে বারীন্দ্রের প্রস্তাব মতো অরবিন্দ যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করে সশস্ত্র আন্দোলন এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্ব অস্বীকার করে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করতে থাকেন। এছাড়া তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র দুই ভাই-ই বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন যুবকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। এজন্য কুড়ির কোঠার বয়সের কুড়িজন যুবক নিযুক্ত করে 'আশ্রম ফর রেভেলিউশনারি সন্ন্যাসিজ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে সেখানে তাদের ধ্যান, গীতাপাঠ, উপনিষদ পাঠ, ভারতীয় ইতিহাস পাঠ, অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনর আলোচনা, জুজুৎসু, কুস্তি ও লাঠিখেলা শেখানো হতো। সামরিক কৌশল ও আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। বারীন্দ্র ও তাঁর এই দল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন এবং সেজন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। দেশবাসীর ওপর চরম অত্যাচার ও নিষ্পেষণের বদলা নেবার স্পৃহা সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল। বারীন্দ্র ও তাঁর গোষ্ঠী মানুষের এই স্পৃহাকে সম্মান দিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে তাঁদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাঁদের এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রথম লক্ষ্য ছিলেন বাঙ্গলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। ১৯০৭-এর ৬ ডিসেম্বর সংঘটিত সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁদের পরের লক্ষ্য ছিল চন্দননগরের মেয়র এল টারডিভেল। এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। এর পরের লক্ষ্য ছিলেন বিহারের মুজফ্ফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ড। কিংসফোর্ড স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করতেন। কিশোর সুশীল সেনের ওপর তার অত্যাচার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বারীন্দ্র ঘোষ ও তাঁর দল এর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। বারীন্দ্র এই মিশনের জন্য আঠেরো বছর বয়সি ক্ষুদিরাম বসু ও উনিশ বছর বয়সি প্রফুল্ল চাকীকে নিযুক্ত করেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ভুলবশত তাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় দুজন ইংরেজ মহিলা মারা যান। কিংসফোর্ড বেঁচে যান। এখানে উল্লেখ্য, এই ঘটনার আগের দিন ২৯ এপ্রিল অরবিন্দ ঘোষ তাঁর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখেছিলেন, "Revolution, bare and grim, in preparing her battle field moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could wish otherwise. But Gods Will be done". পরেরদিন ১ মে পুলিশ কমিশনার মুজফ্ফরপুরে একটি জরুরি মিটিং ডাকেন। সেই মিটিঙের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ মে ভোরে কলকাতা-সহ আর্য কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালায় এবং অরবিন্দ-সহ কুড়িজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দকে তারা মূল নেতা বলে চিহ্নিত করে। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও নথিপত্র উদ্ধার করে। এই তল্লাশি মাসাধিককাল ধরে চলে। গ্রেপ্তার হওয়া বিপ্লবীদের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ। গ্রেপ্তার হওয়া বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হেমচন্দ্র দাস, কানাইলাল দত্ত, সুশীল সেন, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখ। এদের বেশিরভাগই গ্রেপ্তার হন মানিকতলার মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি থেকে। এই ঘটনাকে মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়। আলিপুর অ্যাডিশনাল সেশন জজের কোর্টে এই মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মামলাটিকে আলিপুর বোমার মামলা বলেও অভিহিত করা হয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কারা কাহিনীতে লিখেছেন, '' ১৯০৮ সনের শুক্রবার ১ মে আমি 'বন্দেমাতরম্' অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি ইউরোপিয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের 'এম্পায়ার' কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিশ কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখনও যে আমি এই সন্দেহের লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা।"

শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হন ৪৮ নং গ্রে স্ট্রিট (বর্তমানে অরবিন্দ সরণি) থেকে। তিনি কারাকাহিনীতে লিখেছেন, '' শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছিলাম। ভোরে প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র

পুলিশে ভরিয়া উঠিল; সুপারিন্টেনডেন্ট ক্রেগান, ২৪ পরগনার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইন্সপেক্টর, লালপাগড়ি গোয়েন্দা, খানাতল্লাশির সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, অরবিন্দ ঘোষ কে? আপনিই কি?' আমি বলিলাম, 'আমিই অরবিন্দ ঘোষ'। অমনি একজন পুলিশকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগারের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাকবিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাশির ওয়ারেন্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। বুঝিলাম, এই পুলিশ সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানি কনস্টেবল সেই দড়ি ধড়িয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিশ উপরে আনে।, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি।" শ্রীঅরবিন্দের এই গ্রেপ্তার সম্পর্কে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থে লিখেছেন, '' ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী নেতা, ভাবীকালের পৃথিবীখ্যাত 'সুপারম্যান' শ্রীঅরবিন্দকে পুলিশসুপার ক্রেগান হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দি করে ফেললেন। সেই দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশী একটি হিন্দুস্থানী কনস্টেবল। তারপর শৃঙ্খলিত বন্দিকে হাঁটিয়ে নেওয়া হলো সরকারের প্রয়োজন মতো দূরত্বে।" তাদের সেখান থেকে প্রথমে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৪ মে অবধি পুলিশ কাস্টডিতে রাখা হয়। ৫ মে তাঁদের আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, ' ৫ মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পর বৎসর ৬ মে নিষ্কৃতি পাই।'

পুলিশ ২ মে ৩২ নং মুরারীপুর রোডের বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালায়। শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্র ও তার দলবলকে বারে বারে সতর্ক হতে বলেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবীর বিরুদ্ধে পুলিশ 'ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা'র অভিযোগ আনে। অভিযোগগুলি হলো, 'waging war against His Majesty the King-Emperor of India', conspiring to deprive His Majsty the King-Emperor of India of the Sovereignty of British India or a part thereof..., " to overawe by criminal force the Govornment of India or the local Govornment of India ইত্যাদি। আলিপুর সেসন কোর্টে এই বিচার চলে ১৯০৮-এর মে থেকে ১৯০৯-এর মে অবধি। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী জেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাজসাক্ষী হয়ে যায়। সে এই ষড়যন্ত্রের মূল নেতা বা 'বড়ো কর্তা' হিসেবে অরবিন্দ ঘোষকে চিহ্নিত করে এবং বারীন্দ্রকে 'ছোটো কর্তা' বলে রাজসাক্ষী হিসেবে বিবৃতি দেয়। সে তার বিবৃতিতে আরও বলে যে, অরবিন্দ বিভিন্ন ডাকাতির বিষয়ে শুধু জানতেন তাই নয়, তিনি মানিকতলায় বোমা তৈরির মূল কাণ্ডারি ও পরিকল্পনাকর্তাও। বারীন্দ্র ঘোষও স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। তিনি দাদা অরবিন্দ বাদে সবার নাম বলেছিলেন। এটা সে করেছিল অরবিন্দের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও। বারীন্দ্রের সঙ্গী হয়েছিলেন উল্লাসকর ও উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নরেন গোঁসাইকে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জেলের মধ্যেই হত্যা করেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার ফলে অরবিন্দের বিরুদ্ধে আর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ রইল না। অরবিন্দ কিছুই স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন তাঁর কিছুই জানা নেই। বিপ্লবীর ধর্ম তিনি পালন করলেন। যদিও বারীন্দ্র ও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথারীতি বহাল থাকে। মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন ছিলেন এই মামলার সরকারি কৌসুলি। নর্টন সম্পর্কে অরবিন্দ লিখেছেন, 'আমিও তেমনই নর্টন সাহেবের ' প্লটের' কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man, আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরেজি লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন 'অরবিন্দ ঘোষ।' এই মামলার অতিরিক্ত সেশন জজ ছিলেন সি পি বিচক্রফট। বিচক্রফটের সঙ্গে দুজন অ্যাসেসর ছিলেন। তাঁদের নাম গুরুদাস বসু ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই বিচক্রফট ছিলেন কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী। আইসিএস দিয়েছিলেন একসঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন অরবিন্দের ব্যারিস্টার। প্রায় এক বছর ধরে এই মামলা চলে। ১৯০৯ সালের ৬ মে সেশন জজের রায় বের হয়। বিচারে বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে নানা ক্রমের শাস্তি হয়। বাকি পাঁচজনের মধ্যে তিনজন মুক্তি পায়, দুজনের আগের সাজাই বহাল থাকে।

মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলা তথা অরবিন্দের এই মামলা ও বিচারে তাঁর মুক্তিলাভ পৃথিবীর বিচার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দুটি কারণে। প্রথমত, এর প্রধান অভিযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিরোধী নেতা এবং ভাবীকালের বিশ্বের সর্ববরেণ্য 'যোগী' শ্রীঅরবিন্দ। দ্বিতীয়ত, বিনা অর্থে অথচ প্রচণ্ড ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যে এই তরুণ অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই সময়ের তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। যিনি পরবর্তীকালে সর্বোত্তম আইনজীবীদের একজন এবং ভারতীয় জননেতাদের অগ্রগণ্য 'দেশবন্ধু' হয়ে ওঠেন। মহান বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এক বছরের কারাবাসকালে কারাকক্ষে 'বাসুদেব দর্শন' লাভ করেন এবং পণ্ডিচেরীতে ঋষি ও ভগবদ্দ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোক দান করে বিশ্বকবির নমস্কার পেয়েছেন। কবি লিখেছেন— 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' উত্তরপাড়া অভিভাষণের শেষে এই মহান ঋষি, অখণ্ড ভারতের পূজারি বলেছেন— 'সনাতন ধর্ম, এটিই হচ্ছে ভারতের জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।' □

অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে সাধনা করতেন শ্রীঅরবিন্দ

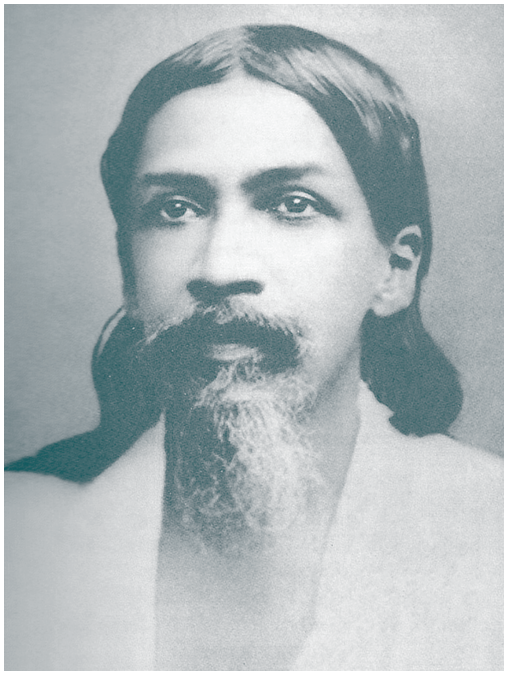

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ফুটলো অরবিন্দ

১৮৭৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শে বিপিনচন্দ্র পাল (৭ নভেম্বর, ১৮৫৮— ২০ মে, ১৯৩২) হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে হলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে তিনি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড গেলেন (১৮৮৯)। বাগ্মিতার জন্যই সেখান থেকে অন্য একটি বৃত্তি নিয়ে গেলেন আমেরিকা। দুর্দান্ত সেই বক্তৃতা, শুনে মোহিত হয়ে যেতেন মানুষ; তখনও স্বামীজী আমেরিকায় পৌঁছাননি। কিন্তু প্রবল ধাক্কা খেলেন আমেরিকার এক শ্রোতার কাছ থেকে। তিনি এক অতি সত্য অথচ তেতো-কথা শোনালেন বিপিনকে, বললেন একজন পরাধীন দেশের মানুষের কাছ থেকে কোনো কথাই তারা শুনবেন না, শুনলেও তা গ্রহণ করবেন না। কথাটি দারুণ বাজলো বিপিনের।

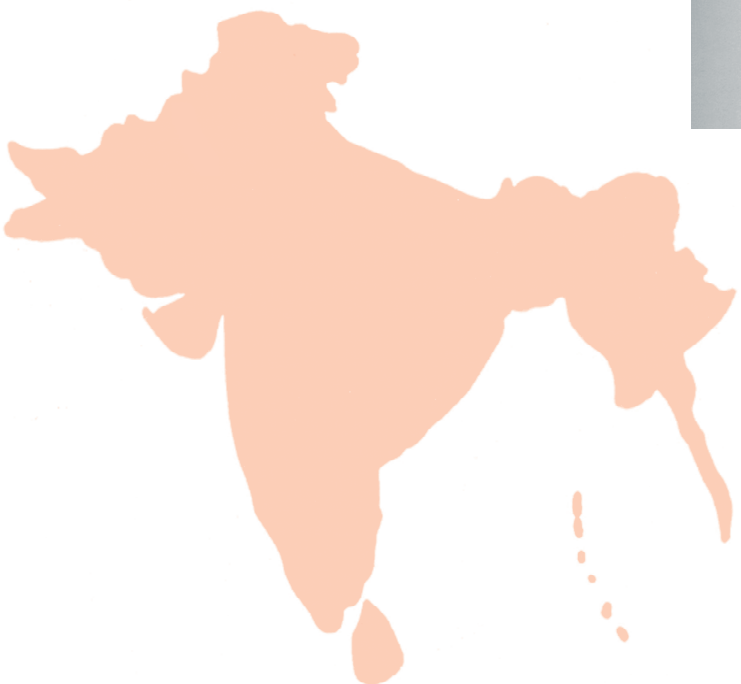

শপথ নিলেন দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতেই হবে, তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেবেনই তিনি। ফিরলেন দেশে, সুযোগ পেলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ন্যাশানাল লাইব্রেরি) গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করার। পড়লেন অসংখ্য বই। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের দীক্ষায় দেশের সনাতনী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহ বাড়লো। সেই সময় দেশপ্রেম আর হিন্দুত্বের প্রতি আগ্রহকে সমার্থক বলে বিবেচিত হতো। ১৮৯২ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে নিলেন বৈষ্ণব মতে দীক্ষা। এরপরই শুরু হলো রাজনৈতিক সক্রিয়তা— অনলবর্ষী বক্তৃতা আর সেই সঙ্গে নির্ভীক কলম। ১৯০১ সালে সম্পাদনা করলেন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউইন্ডিয়া'; তাতে চললো রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার। বুঝলেন দেশের কাজের জন্য বলিষ্ঠ মানুষ চাই। যোগ্য মানুষ তৈরির জন্য তাই দেশবাসীকে বারেবারে উদ্বুদ্ধ করলেন। সেই সময় বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে শেষ করে দেবার জন্য বাঙ্গলাকে ভাগ করলো ইংরেজ। ১৯০৫-এ শুরু হলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, তার রাশ নিজের হাতে নিলেন বিপিনচন্দ্র। ১৯০৬-এর আগস্টে প্রকাশ করলেন ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমারতম্', তাতে শামিল করলেন অরবিন্দ ঘোষকে। ব্যাস, আগুনে রাঙ্গা হলো বাঙ্গলার বিপ্লববাদের দাবানল। অর্থাৎ অখণ্ডতার সাধনা দিয়েই অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ শুরু হলো। অখণ্ড বাঙ্গলার জন্য আন্দোলন। বঙ্গজননী আর ভারতমাতা অরবিন্দের কাছে ছিল অভিন্ন। বাঙ্গলাকে ভাগ করতে দেওয়া যায় না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়ে দেশমাতৃকার ঋণ শোধ করতে উদ্যত হলেন অরবিন্দ।

অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনা

ভারতমাতা হচ্ছেন অখণ্ড ভারতবর্ষের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মাতৃকা সাধনার এক সনাতনী ভৌমরূপ। ভারতবর্ষ নামক এক অতুল্য দেশকে জননী জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তির নামই ভারতমাতা-পূজন। যে দেশে আমার জন্ম, যে দেশের সম্পদ গ্রহণ করে আমার এই শরীর, যে দেশের গৌরবে আমার অন্তঃকরণ আনন্দ লাভ করে, যে দেশ আমাকে অন্তরাত্মার সন্ধান দিয়েছে— তারই মাতৃরূপা ভারতমাতা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আর্যবীণা' পর্যায়ে 'ভারতমাতা' নামে দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন (৯ ও ২৩ শংখ্যক) 'আর্যবীণা' কাব্য-পর্যায়ে। এছাড়াও 'বিষণ্ণাভারতী', 'আয় ভারতসন্তান' প্রভৃতি কবিতায় ভারতমাতার আভাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর 'রাণা প্রতপ সিংহ' নাটকের (১৯০৫) চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে দেখা যায় পৃথ্বীরাজ গাইছেন যুদ্ধে আহ্বানের গান; যেন ভারতমাতা ডাক দিয়েছেন— মোগলদের বিপ্রতীপে দেশের পীড়িত ধর্মকে রক্ষা করতে হবে, হিন্দুস্থানের বিপন্না জননী -জায়াকে রক্ষা করতে হবে, রক্ষা করতে হবে নিলাঞ্ছিত ভারত নারীকে। আর সেজন্যই রণসাজে যেতে হবে সমরে।

এখানে ভারতমাতার স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। আর ভারতমাতার সন্তানেরা কোষ উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে লড়াই করবেন। আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮১) উপন্যাসে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারার উদ্ভব হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে সেই ক্ষীর প্রবাহিত হয়ে পরিপুষ্ট লাভ করল। স্বামীজী বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। সিস্টার নিবেদিতার 'Kali the Mother' কবিতার আদর্শে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনায় ব্রতী হলেন অরবিন্দ।

ভারতমাতার সামনে সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ করে দেশমাতাকে রক্ষা করার পুণ্য শপথ নিই আমরা। দেবীকে অর্ঘ্য সমর্পণ করে ধ্যান করা হয় অখণ্ড ভারতবর্ষের, স্মরণ করা হয় তাঁর চিন্ময়ী রূপ, সে আরাধ্য মূর্তি যেন দশভুজা দেবী দুর্গা। ভারতমাতার পুজো মানে রাষ্ট্রীয় বেড়া বাধার ব্রত, দেশকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলার ব্যায়াম, ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী গড়ে তোলার রাখিবন্ধন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার শপথ গ্রহণ। যে মাটি আমাদের খাদ্যের ভাণ্ডার, যে মাটিতে আমাদের পদচারণা, যে মাটির বুকে আমাদের বসতি, তাকে ধন্যবাদ দেবার চিরন্তন-চিন্তনই যেন ভারতমাতার পুজো। মাটিই মা, মাতৃকা আরাধনার চরম দার্শনিকতা হলো ভারতমাতার পুজো। ভারতবর্ষ পুণ্য ভূমি; এই দেশ কেবল আমাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানই দেয়নি, দিয়েছে এক অচিন্ত্য বিস্ময়— 'Each soul is potentially divine.' ভারতবাসী অমৃতের সন্তান, পুণ্য-পবিত্র।

শ্রীঅরবিন্দের দেশমাতা

৩০ আগস্ট, ১৯০৫-এ অরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে (২৪ আগস্টে লেখা পত্রের উত্তরে) একটি পত্রে লিখছেন, ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান যে গুণ, যে প্রতিষ্ঠা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল তাহা ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড়ো অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মতো ছাড়িয়া দিলাম। আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোনো মতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদেরও হিত করিতে হয়। অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। কার্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।''

শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। দেশমাতাকে দেবী দুর্গাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন বঙ্কিম। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে যে দেশমাতা, তিনি যেন দেবী দুর্গারই অন্যতম রূপ। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি/হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।। ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/ কমলা কমল দল-বিহারিণী'। শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্রেও দেখতে পাই ভারতবর্ষ নামক দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তিনি দেবীকে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রকট হতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। 'Mother Durga ! Rider on the lion, giver of all strength, Mother, beloved of Siva! We, born from thy parts of Power, we the youth of India, are seated here in thy temple. Listen, O Mother, descend upon eath, make thyself manifest in this land of India.'

ভারতকে কেন বড়ো হতে হবে?

শ্রীঅরবিন্দের Inclusive Hinduism and Social Inclusion সম্পর্কে পরিপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে। তিনি হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় 'ধর্ম-রক্ষিণী সভা'য় এলেন ভাষণ দিতে ১৯০৯ সালের ৬ মে। এটি Uttarpara Speech' নামে বিখ্যাত। বললেন, 'অন্যান্য ধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ কিন্তু সনাতন ধর্মই হচ্ছে জীবন; এটি এমন জিনিস যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্যে এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। এই ধর্ম দেবার জন্যেই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্বলকে পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকিরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড়ো হতে হবে তাও তার নিজের জন্যে নয়, মানবজাতির জন্যে।' (বাংলা অনুবাদ : অনিলবরণ রায়)

ভারতবর্ষ ও সনাতনধর্ম

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ এবং সনাতনধর্ম এক ও অভিন্ন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তাঁর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেয়েছি ও সে বক্তব্য আদতে ভগবান কৃষ্ণের বলে তিনি অভিহিত করেছেন। যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড়ো করে তোলার অর্থ দেশকেই বড়ো করে তোলা।"

তখনও তিনি তথাকথিত ঋষি হয়ে ওঠেননি। মানিকতলা বোমার মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তার আগে এক বছর কারাগারের নির্জনবাসে কাটিয়ে কারা-জাতক বাসুদেবের দর্শন পেয়েছেন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে যা বলবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তা বলা হলো না, বরং যে কথা তিনি বললেন, তা কারা-দেবতা বাসুদেবেরই কথা, যাঁর দিব্য দর্শন পেয়েছিলেন আলিপুর জেলের কুঠুরিতে বসে। অরবিন্দ বলছেন— ''আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতনধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতনধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশলাভ করে, যখন সনাতনধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতনধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতো তাহলে সনাতনধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হতো।"

কারাগারে যোগাভ্যাস

শ্রীঅরবিন্দ 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে লিখলেন, ''কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা এবং সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত এবং এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা দুই ঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দু'একটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিষ্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। কাল যেন তাহার (বিদ্রোহী মন) উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন।

প্রথমত, কীরূপ মনের গতিতে নির্জন কারাবাসের কয়েদি উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে ইউরোপীয় জেল প্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন এবং যাহাতে আমার সাধ্যমতো আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেল প্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন। ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধহয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্যে লাগান আমার যোগালিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা-সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।"

ক্রমে যোগাভ্যাস করে শ্রীঅরবিন্দ কারাজীবনে পেলেন এক পরামানন্দের সন্ধান। তখন আর মনে হতো না, কারার উচ্চ দেওয়ালে তিনি বন্দি। সর্বত্রই দেখতেন বাসুদেবের দিব্য উপস্থিতি। কয়েদিদের দেহের মধ্যে যেন পরিলক্ষিত হচ্ছিল ভগবান নারায়ণ। সাধু পুরুষ আর ছোটোলোকের মধ্যে ভেদ খুঁজে পেলেন না। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি বলছেন, 'যে জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দি নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডা রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপরে শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম— চোর, খুনি, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অবব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম। ভগবান আমাকে বললেন, দেখ, কী সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।

অরবিন্দকে নিয়ে রবীন্দ্র

শান্তিনিকেতনে বসে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'নমস্কার' কবিতাখানি; যার শুরুতেই চমক, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!' পাণ্ডুলিপির পাতার উপরে 'ওঁ' লিখে শুরু করছেন কবিতা। পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে, অরবিন্দকে কবির সম্বোধন--- 'হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি'। কয়েক পঙ্‌ক্তিতে অরবিন্দের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য--- 'তোমা লাগি নহে মান,/নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান/চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভুলে যায় ভয়। তিনি বিধাতার শ্রেষ্ঠ-দান; কারণ তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে দেশের হয়ে চাইছেন 'পূর্ণ অধিকার', সত্যের গৌরব। আর বিধাতাও যেন প্রার্থনা শুনেছেন, তাই বেজে উঠেছে জয়শঙ্খ।

অরবিন্দ কারাবরণ করেছেন (১৯০৮ সালের ২ মে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার এবং ৫ মে থেকে আলিপুর জেলে বন্দি), তাই তাঁর ডান হাতে আজ 'কঠোর আদর'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, এই কারাবেদনা থেকেই দেশের মানুষ বল পাবেন। অরবিন্দ 'রুদ্রদূত', দেবতার প্রদীপ হাতে করেই তাঁর আবির্ভাব। তাই কেউই তাঁকে শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন না। এমনকী তাঁর বন্ধন-শৃঙ্খল তারই চরণ বন্দনা করছে, কারাগার জানাচ্ছে অভ্যর্থনা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, মিথ্যাবাদী রাজা তার রাজদণ্ড প্রয়োগ করেছেন এমনই এক ব্যক্তিত্বকে যিনি সৃষ্ট হয়েছেন প্রলয়-অনলে, যিনি পেয়েছেন প্রাণ মৃত্যু হতে। অরবিন্দ যেন বিধাতার নিজের হাতে গড়া হাসিমুখ ভক্ত, আর তাকেই তিনি বিনা অস্ত্রে পাঠিয়েছেন শত্রুদের মাঝে রাতের অন্ধকারে।

এ কেমন খেলা! তবে কিছুই কি নেই দুঃখ, ক্ষত, ক্ষতি সর্বভয়? তবে কিছুই কী নেই রাজা, রাজদণ্ড, মৃত্যু, অত্যাচার? যদি তা নাই থাকে, যদি বিধাতা পুরুষ নিজের সৃষ্টিকে ভয়ের পরিমণ্ডলে পাঠাতে পারেন অনায়াসে, তবে কেন আমরা ভীরু, মূঢ় হয়ে মাথা নামিয়েছি নীচে? কেন বলতে পারছি না, তোমার চির-সত্ত্বা স্থির শাশ্বত-সত্য বলেই আমাদের মাথা উঁচু করে তুলতে হবে!

গীতার ভূমিকা এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন

শ্রীঅরবিন্দ 'গীতার ভূমিকা' গ্রন্থে লিখছেন, ''একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন। রাজা ধর্মরক্ষা করিবেন, প্রজারঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতা ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাদপদ হইতেন না। তিনি যুগের প্রধান বিপ্লবকারী। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধের ঈশ্বরনির্দিষ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহারথী অর্জুন।" শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে মনে হয় ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে এমন ব্যক্তির চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যার মধ্যে যুধিষ্ঠির- ভীম-অর্জুনের সমবেত ঐশ্বর্য রয়েছে। ভাগবত শক্তির মোহন চূড়া নরশ্রেষ্ঠের কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবে এবং সমগ্র বিশ্ব সাক্ষী থাকবে সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের।

রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ ছাড়া কি আর কিছু পন্থা আছে?

একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, রাজনৈতিক-জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের রাজনৈতিক আঙ্গিক ব্যতিরেকেও অনান্য পন্থা রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন :

১. 'বন্দেমাতরম্'-এর মতো সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত করা যায়। আজকের দিনে বিক্রি হয়ে যাওয়া সাংবাদিক, সম্পাদক ও অপরাপর সংবাদমাধ্যমগুলি দেখিয়ে দেয়, দেশবিরোধিতার কৌশল শিক্ষিত সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং অজান্তেই তারা প্রতিবেশী দেশের প্যাসিভ সাপোর্টার হয়ে যান। কাজেই সুস্থ সাংবাদিকতাও একটি দেশপ্রেম।

২. দেশপ্রেম জাগে দেশের মাঙ্গলিক ও শুভঙ্করী ঐতিহ্যের সঙ্গে মানসিক নৈকট্যে। অরবিন্দের অগুনতি লেখা সেই ভারতবোধ সঞ্জাত।

৩. রাষ্ট্রবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ্য সঙ্গত করাও দেশপ্রেম। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে সে পথ দেখিয়েছেন।

৪. ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির অনুসরণ মানেই জাতীয়তাবোধ, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, অন্যত্রও তার প্রকাশ আমরা বারে বারে দেখেছি।

৫. সামাজিক মেলবন্ধন ও মিলনমন্দির ভাবনা এক অনবদ্য জাতীয়তাবোধের প্রকাশভূমি। শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দির, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'শাখা', শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার কেন্দ্র প্রভৃতিকে এককথায় সামাজিক জাতীয়তাবোধের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস বলা যায়।

কজেই প্রত্যেক ভারতবাসী তার পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের কাজ করবেন। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে একটি জোর-ঝটকা, সময়ে সময়ে অধিক প্রাসঙ্গিক, কিন্তু জাতীয়তাবোধের ভিত্তিভূমি নড়বড়ে হলে চলে না। অন্য নানান পথে সমন্বিতভাবে এগোতে হবে, তবেই গৈরিক-জাতীয়তাবোধ ভারতরাষ্ট্রে চিরায়ত (sustainable) সংস্কৃতির অঙ্গ হবে। নইলে 'বানের জল' এসে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধকে 'ঘোলা' করে দেবেই, তাই সাবধান থাকতে হবে।

(লেখক বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক)

বাঙ্গালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে ডাকটিকিট

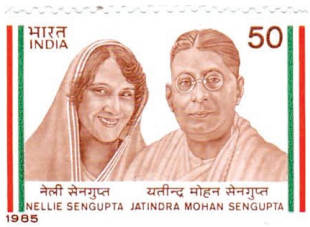

ড. কল্যাণ গৌতম

ডাকটিকিট সংগ্রহ এবং চর্চা সারা বিশ্বেই বাল্যকাল ও কিশোর বয়সের অন্যতম হবি বা শখ। নিজের দেশ, তার সংস্কৃতি, পালপার্বণ, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞানের অগ্রগতি জানতে এবং দেশীয় মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হতে ডাকটিকিটে প্রকাশিত ছবি, তার প্রথম দিনের আবরণী (First day cover), ব্রোশুরে (Brochure) প্রকাশিত তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রশাসক যদি প্রচলিত শিক্ষার বাইরেও সুবিধাজনক স্থানে দেশকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পান, তবে সেই মাধ্যম অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত এবং নিয়মিত সম্প্রসারণযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা উচিত। সামগ্রিকভাবে Philately বা ডাক-সংক্রান্ত সামগ্রী এই ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

বাঙ্গলার বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে সবচাইতে বেশি সংখ্যক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার বিষয়ে। বিপ্লবীদের 'মহাগুরু' স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েও ভারতের ডাকবিভাগ বহু স্ট্যাম্প প্রকাশ করে। শিক্ষাবিদ ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি নিয়ে চিন্তাভাবনাকারী এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণকারী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়েও বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট প্রকশিত হয়েছে।

ঠাকুর-মা-স্বামীজী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা এবং শ্রীঅরবিন্দ এসেছেন ডাকটিকিটে। নবজাগরণের অন্যতম পুরোহিত রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরও। প্রশ্ন উঠবে স্বাধীনতা সংগ্রামে কীভাবে তারা প্রেরণা দিয়েছেন? বাঙ্গালিকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় প্রেরণা দিলেন রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর। বাঙ্গালি কুসংস্কার মুক্ত হয়ে জেগে উঠলো। আর এটাও মনে রাখতে হবে ভারতমাতার

এক স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। যিনি ব্রহ্মময়ী, তিনিই দেশমাতৃকা, তিনিই ভারতমাতা। তাই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ছিল বিপ্লবীদের এক মহাশক্তির আধার। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এই ত্রয়ী ছিলেন মহাবিপ্লবের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিরঞ্জিত মৃত্তিকা বিপ্লবীদের কাছে ছিল এক tremendous explosive material। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মনে রাখিস ইংরেজরাই এদেশের সর্বনাশ করছে।' স্বামীজী বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। নিবেদিতার আদর্শে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনায় ব্রতী হলেন অরবিন্দ।

স্বাধীনতাকামী গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির মূল শক্তি ছিল বাঙ্গলার

শক্তিভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে ব্যায়ামের আখড়ার আড়ালে বঙ্গদেশে স্থাপিত হয় সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'। এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং। শাক্তদর্শনে বিশ্বাসী ছিল এই সংগঠন। সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী সারদানন্দ, জাপানি কাকুজ ওকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সংগঠনের। শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি শিখতেন সদস্যরা। পাঠ নিতেন নৈতিকতার এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতার। স্বামীজীর দর্শন ও দেশপ্রেম তাদের নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। নিবেদিতার বাসাও ছিল গুপ্ত সমিতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনা থেকেই একদিন বঙ্গীয় যুবকদের শক্তির উৎসকে খুঁজে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ।

ভারতীয় ডাকটিকিটে 'মহা বিপ্লবী' স্বামী বিবেকানন্দ :

১৯৬৩ সালের ১৭ জানুয়ারি স্বামীজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতের ডাকবিভাগ ১৫ নয়া পয়সা দামের রঙিন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এই ডাকটিকিটে ইংরেজিতে স্বামীজীর সাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ২০০ পয়সা দামের রঙিন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। বিষয় : স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ।

১৯৯৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশ পায় ৫০০ পয়সা দামের রঙিন স্মারক ডাকটিকিট। বিষয় : বিবেকানন্দ শিলা স্মারক, কন্যাকুমারী। শিলা স্মারক মন্দিরের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রথম দিনের আবরণী বা খাম (First Day Cover)। ১০ লক্ষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, প্রতিটি শিটে ২০টি ডাকটিকিট ছিল, প্রতিটি টিকিটের মাপ ২.৯০×৭.৮২ সেমি এবং ছাপানো অংশ ২.৫৫×৭.৪৫ সেমি। ফোটো অফসেট পদ্ধতিতে ডাকটিকিটগুলি ছাপানো হয়েছিল। ছেপেছিল কানপুরের কলকাতা সিকিউরিটি প্রিন্টার্স লিমিটেড।

২০১৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষে চারটি বহুরঙা স্মারক ডাকটিকিট ও প্রথম দিনের আবরণী খাম প্রকাশিত হয়। ডাকটিকিটগুলির দাম যথাক্রমে ২০ টাকা (প্রেক্ষাপট : দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও স্বামীজীর পাগড়ি পরিহিত ছবি), ৫ টাকা (প্রেক্ষাপট : বিবেকানন্দ শিলা ও দণ্ডি হাতে মুণ্ডিত মস্তক স্বামীজীর পরিব্রাজক বেশে ছবি), ৫ টাকা (প্রেক্ষাপট : শিকাগো মঞ্চ ও হল, স্বামীজীর পাগড়ি পরিহিত বেশ) এবং ৫ টাকা (প্রেক্ষাপট বেলুড় মঠ ও পাগড়ি বিহীন চুলে স্বামীজীর ছবি)

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে 'Makers of India' সিরিজের একটি ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্পে একরঙা আবক্ষ ছবিতে স্বামীজীকে পাওয়া যায়। ডাকটিকিটটির মূল্য ছিল ৫ টাকা।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকার সংক্রান্ত ডাকটিকিট :

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের সহযোগিতায় (Monetary, military and political) অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার হিসেবে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। সেইসঙ্গে গঠিত হলো সেই সরকারের নিজস্ব মুদ্রা, আদালত, সিভিল কোড এবং ডাকটিকিট।

আজাদ হিন্দ সরকার ৬টি নকশার মোট ১০টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ডাকটিকিটগুলি জার্মানির সরকারি দপ্তর থেকে জার্মান ডাকসেবার সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ছাপানো হয়েছিল, ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। জানা যায়, ডাকটিকিটগুলির নকশা করেছিলেন দুইজন প্রথিতযশা জার্মান চিত্রশিল্পী (ওয়ারনার এবং মারিয়া ভন অ্যাক্সটার-হেন্ডথলাস)। ছবি দেখে, তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলেই নেতাজী টিকিটগুলি ছাপানোর ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। যে ছটি নকশা ছিল, তা পৃথক মূল্যের। যুদ্ধে আহত সেনার চিকিৎসা, মহিলা কর্তৃক চরকা কাটার ছবি (তিন রঙের ডাকটিকিট— নীল, লাল ও গেরুয়া), শৃঙ্খলিত অখণ্ড ভারত (দুই রঙের টিকিট— নীল ও বেগুনি), সেনার হাতে মেশিনগান (খয়েরি) এবং লাঙ্গল ও ধানের ছবির সঙ্গে জোড়া-বলদ দিয়ে কৃষি কাজের ছবি (লাল ও সবুজ)। ডাকটিকিটগুলি কোনোটি এক আনা, কোনোটি দুই, আড়াই, তিন বা আট আনা মূল্যের।

ভারত সরকার নেতাজীর উপর বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। ১৯৬৮ সালের ২১ অক্টোবর সেই সরকারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ২০ পয়সা দামের একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারতীয় ডাকবিভাগ। টিকিটের ব্যাকগ্রাউন্ডে দুপাশে দুটি খাপখোলা তলোয়ার টাঙানো; পিছনে আজাদ হিন্দ লেখা ও লম্ফনরত একটি বাঘের ছবি দেওয়া পতাকা, সামনে চশমা পরিহিত নেতাজী কাগজ খুলে কিছু পড়ছেন। নীচে ইংরেজিতে লেখা Azad Hind Govt. 25th Anniversary.

১৯৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁর জন্মশতবর্ষে ১০০ পয়সা দামের একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, সেখানে হিন্দি ও ইংরেজিতে পুরো নাম লেখা, আর উল্লেখ আছে তাঁর জন্ম সাল ও শতবর্ষ সালের, ১৮৯৭-১৯৯৭। ২০১৮ সালে পোর্টব্লেয়ারে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ৭৫ বর্ষপূর্তিতে তিনটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারতীয় ডাকবিভাগ। ২২ টাকা দামের টিকিটটি সাদাকালোয় ছাপানো। সেখানে দেখা যায়, নেতাজী অভিবাদন গ্রহণ করছেন, বাঁদিকে নেতাজী, ডানদিকে ছয়জন সেনার কেউ পতাকা, কেউ রাইফেল পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ৪১ টাকা মূল্যের টিকিটে পিছনে তেরঙ্গা পতাকার সামনে অভিবাদন গ্রহণকারী নেতাজী মিলিটারি পোশাকে দাঁড়িয়ে। অপর টিকিটটি ১২ টাকা মূল্যের।

১৯৯৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ২ টাকা দামের একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন নির্ভিক জওয়ানের ছবি ছাপা হয়েছে— শাহনেওয়াজ খান, পি.কে. সায়গল এবং জি.এস. ধীলন। ডাকটিকিটে এ বিষয়ে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা আছে, India's Struggle : Three INA Stalwarts. এই সমস্ত স্মারক ডাকটিকিটগুলি ছাড়াও ১ টাকা মূল্যের একটি ডেফিনিটিভ টিকিট ছাপানো হয়, সেখানে নেতাজীর আবক্ষ ছবি।

মঙ্গল পাণ্ডেকে নিয়ে ডাকটিকিট :

১০.০৫.১৯৮৪ তারিখে 'India's struggle for freedom' শিরোনামে চারজন সংগ্রামীকে স্মরণ করে চারটে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, তার অন্যতম মঙ্গল পাণ্ডে, মূল্যমান ৫০ পয়সা। তিনি ১৮৫৭ সালে সংঘটিত স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গদেশে বাস করেই। কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ব্যারাকপুর একটি মহকুমা শহর। উত্তরে কাঁচড়াপাড়া থেকে দক্ষিণে বরানগর পর্যন্ত 'বারাকপুর' মহকুমা বিস্তৃত।

গঙ্গাতীরবর্তী এই শহরটি সিপাহি বিদ্রোহ ১৮৫৭ বা ভারতীয় জাতীয় মহাবিদ্রোহের কারণে বিখ্যাত। এর সূত্রপাত ঘটেছিল মঙ্গল পাণ্ডের মাধ্যমে, কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরে।

বিপ্লবী মঙ্গল পাণ্ডে ছিলেন প্রথম প্রতিবাদী, যিনি ব্যারাকপুর থেকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন। এই ঘটনা ব্যারাকপুরকে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে সিপাহিদের প্যারেড ময়দানে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ উপমহাদেশের প্রথম ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন সিপাই মঙ্গল। সেদিন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় বারাকপুরে নিযুক্ত ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্টির তরুণ সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর সহকর্মীদের কাছে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। ফলে মেজর হিউসন ও লেফটেন্যান্ট বগ মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করতে এলেন। পাণ্ডের গুলিতে আহত হলেন বগ। ফলে ৬ এপ্রিল সামরিক আদালত বসিয়ে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো এবং ওই বছরেই ৮ এপ্রিল ভোর পাঁচটা তিরিশ মিনিটে মহাবিদ্রোহের প্রথম সৈন্যের ফাঁসি হয়ে গেল।

ডাকটিকিটে সিস্টার নিবেদিতা এবং নেলী সেনগুপ্ত :

জন্মসূত্রে ইউরোপীয় দুই মহিলার নাম উল্লেখ করতে হয়, যারা বিদেশ থেকে এসে ভারতবর্ষকে তথা বাঙ্গলাকে আপন মাতৃভূমি কল্পনা করে বাঙ্গলাতেই শেষপর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকার তাঁদের যাথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে শ্রদ্ধা জানান।

এইরকম একজন মহীয়সী নারী হলেন আয়ারল্যান্ডবাসী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, যিনি পরবর্তীকালে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ প্রচারক হিসাবে পরিচিত হন। খ্রিস্টান ধর্মযাজকের কন্যা থেকে তিনি হয়ে উঠলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের ব্যতিক্রমী অস্মিতা। স্বামীজী এমন নারীকেই চেয়েছিলেন, 'ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে।' নিবেদিতা ভারতের গুপ্ত বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানান বই, সাহিত্য, তথ্য ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করতেন। ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর ২০ পয়সা মূল্যমানের একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় সিস্টার নিবেদিতার ছবি দিয়ে।

আর একজন মহীয়সী নারী হলেন পদ্মবিভূষণ শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত (১২ জানুয়ারি, ১৮৮৪-২৩ অক্টোবর, ১৯৭৩), যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আইনজীবী 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫-২৩ জুলাই, ১৯৩৩)-র সহধর্মিণী। নেলী সেনগুপ্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন ১৯৩৩ সালে, যখন সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ব্রিটিশ পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হলেন। কলকতা করপোরেশনেও শ্রীমতী নেলী পরিষেবা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর তিনি স্বামীর জন্মস্থান পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য কাজ করেন। ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৯৮৫ সালের ২২ জুলাই নেলী সেনগুপ্ত এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের যৌথ ছবি-সহ ৫০ পয়সা মূল্যমানের একটি রঙিন ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

মাতঙ্গিনী হাজরাকে নিয়ে ডাকটিকিট :

ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৭.১২.২০০২ সালে ৫০০ পয়সার মূল্যমানের স্বাধীনতা সংগ্রামে অটল এবং নিবেদিতপ্রাণ তেজস্বিনী বৃদ্ধা, তমলুকবাসী মাতঙ্গিনী হাজরার স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে দেশভক্তির পবিত্রতায় তিনি এক প্রেরণাদায়ী মাতৃশক্তিতে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস। ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হলো। ইংরেজকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার ডাক দিলেন গান্ধীজী। সেই ডাক বাঙ্গলাতেও এসে পৌঁছালো। গান্ধীজীর ডাকে বাঙ্গলায় যারা সাড়া দিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম মাতঙ্গিনী। বীরাঙ্গনা এই নারী ছিলেন গান্ধীবাদী, স্থানীয় মানুষ তাই তাঁকে ডাকতেন 'গান্ধীবুড়ি' নামে। ১৯৩২ সালে সংঘটিত আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর যোগদান ছিল। তিনি লবণ আইন ভেঙেছিলেন, ফল হলো কারাবরণ। ১৯৩৩ সালে শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আঞ্চলিক সম্মেলন চলাকালীন পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন তিনি। বেয়াল্লিশের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭২, কিন্তু অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনে। প্রায় ছয় হাজার বিপ্লবীর মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন। মিছিল তমলুক থানা দখল করতে চললো। ১৪৪ ধারার মধ্যেই বীরাঙ্গনা সদর্পে এগিয়ে চললেন। গুলি চললো তিরঙ্গা পতাকা ফেললেন না তিনি, সকলকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেলেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে পতাকা উঁচু রেখেই নশ্বরদেহ ত্যাগ করলেন এই মহীয়সী নারী।

এই নিবন্ধে যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করে এখনও পর্যন্ত ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা আলোচনা করা গেল। অনেকেই বাকি থেকে গেলেন। আবার এটাও ঠিক, অনেকের নামে এখনও ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়নি। আশা করবো ভারতীয় ডাকবিভাগ তাদেরও স্মরণ ও মনন করে পরবর্তীকালে ডাকটিকিট প্রকাশ করে সম্মানিত করবেন। আশা করি তাতে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের আশাও পূর্ণ হবে। □

সোনার ফুলদানিতে প্লাস্টিকের গোলাপ

সন্দীপ চক্রবর্তী

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ইতিহাস তাঁরা লেখেন। কিন্তু একটি জাতির ইতিহাস প্রকৃত অর্থে লেখে সময়। যার ফলে যে ঘটনা ঐতিহাসিকেরা রাজনৈতিক বা অন্য কোনও স্বার্থে চাপা দেন তা একদিন সময় স্পষ্ট করে দেয়।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অবাঞ্ছিত করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ও বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা চেষ্টা কম করেননি। তাঁকে বিশ্বাসঘাতক থেকে শুরু করে ফ্যাসিস্ট সবই বলা হয়েছে। কারণ তিনি নাকি ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই 'মুচলেকা ও মুক্তি' যে একটা বিরাট কৌশলের অঙ্গ সেটা সেই সময়কার কংগ্রেস নেতা, মায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুঝলেও পরবর্তীকালের অন্তঃসারশূন্য কংগ্রেসি নেতারা বোঝেননি। কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে বামপন্থীরাও। এদের, বিশেষ করে বামপন্থীদের বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই। নিজেদের ন্যারেটিভকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা যে কোনও সত্যকে বিকৃত করতে পারেন, এমনকী মিথ্যেও বলতে পারেন। সেই কারণেই কারামুক্তির পর সাভারকরের সঙ্গে রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বোঝাপড়ার কথা তারা সম্পূর্ণ চেপে গেছেন। সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করার প্রস্তাব যে সাভারকরেরই, তাও বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করতে চান না। সাভারকর চেয়েছিলেন ভারতীয়রা আরও বেশি সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে যোগ দিক। বাহিনীতে ব্রিটিশের তুলনায় ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি হলেই বিদ্রোহ করা সম্ভব। যে নৌবিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়, তা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল বাহিনীতে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যের কারণেই। সাভারকরের কারামুক্তি না হলে এসব হতো কি? কংগ্রেসি ও বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে সাভারকরকে নিয়ে তাদের ন্যারেটিভের আড়ালে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন জওহরলাল নেহরুর জীবনের একটি সত্যকে। নেহরু একবার মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশের জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই ঘটনার কথা নেহরু নিজেই লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। গ্রন্থের 'প্রিলিউড টু নাভা' নামের অধ্যায়ে রয়েছে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা। তবে নেহরু কী লিখেছেন সেটা জানার আগে ঘটনার পটভূমি সম্পর্কে একটা আন্দাজ থাকলে ভালো হয়।

পঞ্জাবের নাভা প্রদেশ ছিল স্বশাসিত। ব্রিটিশ সরকার এখানকার রাজাকে বরখাস্ত করে শাসনকাজ পরিচালনার জন্য একজন ইংরেজ প্রশাসক নিয়োগ করে। স্বাভাবিকভাবেই নাভার শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ এই সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেয়নি। নাভায় শিখেরা সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিক্ষোভ দমনের নামে ব্রিটিশ পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার। বিক্ষোভকারীদের আমন্ত্রণেই নাভায় গিয়েছিলেন নেহরু। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

'নাভার মহারাজাকে বরখাস্ত করে ব্রিটিশ সরকার সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করে। এই সিদ্ধান্তে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ তখন রীতিমতো অসন্তুষ্ট। নাভা এবং আশেপাশের শহরতলিতে বিক্ষোভ শুরু হলো। এই বিক্ষোভ চলছিল একাধিক জাঠায় বিভক্ত হয়ে। সেই সঙ্গে চলছিল ব্রিটিশের নির্মম দমন-পীড়ন। বিক্ষোভের খবর আমি পাচ্ছিলাম খবরের কাগজের মারফত। দিল্লির কংগ্রেস অধিবেশনের পর খবর পেলাম আর একটি জাঠা শুরু হয়েছে এবং তাতে যোগ দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। আমি সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ঠিক হলো আমার দুই সতীর্থ এ.টি গিদওয়ানি এবং মাদ্রাজের কে. শান্তনুম সঙ্গে যাবেন।

‘জাইতোতে পৌঁছে জানতে পারলাম পুলিশ জাঠাকে নির্মমভাবে প্রতিরোধ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ আমার কাছে পৌঁছে গেল। নির্দেশপত্রে সই করেছেন ইংরেজ প্রশাসক। তাঁর আদেশ, আমি যেন নাভার সীমার মধ্যে প্রবেশ না করি। যদি আমি নাভায় এসে গিয়ে থাকি তা হলে যেন পত্রপাঠ বিদায় নিই। বলাবাহুল্য, আমার দুই সঙ্গী গিদওয়ানি ও শান্তনুমকেও একই নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। তবে নির্দেশপত্রে ওদের নাম নেই, কারণ ওরা ততটা বিখ্যাত নয়। প্রশাসনকে সবিনয়ে জানালাম যে আমরা জাঠায় অংশ নিতে আসিনি, দেখতে এসেছি। নাভার আইনকানুন ভাঙার ইচ্ছেও আমাদের নেই। তা ছাড়া, আমরা যখন নাভাতে এসেই গেছি তখন নাভায় পা না রাখার কথা তো উঠতেই পারে না। আমরা রাতারাতি হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেও পারব না। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার ট্রেনও অনেক পরে। তাই আপাতত আমরা এখানেই থাকি। একথা বলার পরেই আমাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের লক-আপে বন্দি করা হলো।

‘সারাদিন লক-আপে থাকার পর সন্ধ্যেবেলায় নিয়ে যাওয়া হলো স্টেশনে। আমি আর শান্তনুম একই হ্যান্ডকাপে বন্দি। ওর বাঁ হাতের সঙ্গে আমার ডান হাত। হ্যান্ডকাপের সঙ্গে যে লম্বা চেনটা আটকানো তার অপরপ্রান্ত রয়েছে এক পুলিশকর্মীর হাতে। গিদওয়ানিরও একই অবস্থা। আমরা অনেকটা চেনে বাঁধা কুকুরের মতোই হাঁটছি। যাই হোক আমাদের নাভার জেলে নিয়ে যাওয়া হলো।

নাভার জেলখানার সেলটির অবস্থা ভয়াবহ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা ছেড়েই দিলাম, সেলটা এত ছোটো যে তিনজনে থাকা অসম্ভব। তার ওপর স্যাঁতসেতে ভাব। হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যায় ছাদ। মেঝের ওপরেই শোওয়ার ব্যবস্থা। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো ইঁদুর জাতীয় কিছু একটা দৌড়ে গেল আমার মুখের ওপর দিয়ে। সকালে প্রশাসকের তরফে জেলসুপার এসে বললেন, আমরা যদি নাভায় আসার জন্য দুঃখপ্রকাশ করি এবং ভবিষ্যতে কখনও এখানে না আসার বন্ড লিখে দিই তাহলে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। আমরা জানালাম দুঃখপ্রকাশ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রশাসনেরই উচিত আমাদের কছে ক্ষমা চওয়া। আর বন্ড? অসম্ভব।

আদালতে ট্রায়াল শুরু হলো। আমরা অপেক্ষা করছিলাম জজসাহেব কী রায় দেন তা জানার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনও রায় পড়ে শোনানো হলো না। স্রেফ মুখে জানিয়ে দেওয়া হলো নাভার আইন অমান্য করার জন্য আমাদের ছ’ মাস কারাদণ্ড হয়েছে। আর

দামোদর বিনায়ক সাভারকর

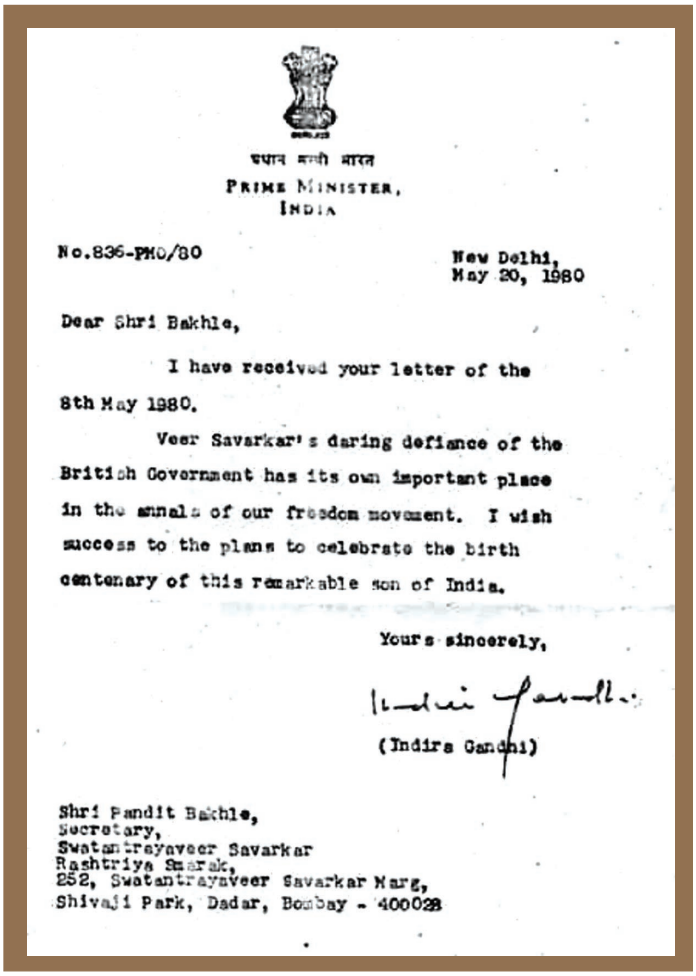

भारत मंत्री भारत
PRIME MINISTER,
INDIA

No.836-PMO/80

New Delhi,
May 20, 1980

Dear Shri Bakhle,

I have received your letter of the 8th May 1980.

Veer Savarkar's daring defiance of the British Government has its own important place in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of this remarkable son of India.

Yours sincerely,

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

Shri Pandit Bakhle,
Secretary,
Swatantrayaveer Savarkar
Rashtriya Smarak,
252, Swatantrayaveer Savarkar Marg,
Shivaji Park, Dadar, Bombay - 400028

সাভারকরকে ‘বীর’ সম্বোধন ইন্দিরা গান্ধীর।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য আরও আঠারো মাস।

আমার বাবা (মোতিলাল নেহরু) কানাঘুষোয় কিছু শুনেছিলেন। এবং আমার জেল হতে পারে ভেবে যথেষ্ট উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত বাবা ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করেন। বাবা নাভায় এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র আবার

নাভার পুলিশ লক-আপ

নতুন করে অশান্তি শুরু হয়। যাই হোক, অনেক অনুরোধ উপরোধের পর জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়।'

মোতিলাল নেহরু সেই সময় কতটা প্রভাবশালী ছিলেন, সে কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। যে ব্যক্তি ছেলের খবর পাওয়ার জন্য স্বয়ং ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করতে পারেন তিনি যে হেঁজিপেঁজি লোক নন তা বলাই বাহুল্য। নাভার পুলিশ রেকর্ড বলছে, জওহরলালের সঙ্গে মোতিলালের সাক্ষাতের পর নাভার জেল কর্তৃপক্ষ জওহরলাল নেহরুকে দিয়ে একটি বন্ডে সই করিয়ে নেয়। এটাই মার্সি পিটিশন বন্ড। বন্ডে আবেদনকারী জানিয়েছেন তিনি আর কোনওদিন নাভায় আসবেন না। মজার ব্যাপার হলো নেহরুর দুই সঙ্গী কিন্তু এই 'সুযোগ' পাননি। জওহরলাল বা মোতিলাল কেউই তাদের কথা ভাবেননি। ব্রিটিশ সরকারের কাছে কান মলে ফিরতি ট্রেন ধরে চলে এসেছিলেন দিল্লিতে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দুটি পৃথক অ্যাটিটিউডকে দেখিয়ে দেয়। সাভারকরের মোট দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের (মোট ৫০ বছরের) শাস্তি হয়েছিল। অর্থাৎ জীবদ্দশায় জেল থেকে বেরোবার কোনও সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। সারাজীবন যদি জেলেই পচে মরেন তাহলে দেশকে মুক্ত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, তার কী হবে? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই সাভারকরকে কুরে কুরে খেত। ঠিক এই সময় গান্ধীজী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেবার অনুরোধ করলেন ব্রিটিশ সরকারকে। সরকার তা মেনেও নিল। সাভারকর সুযোগটা কাজে লাগালেন। ততদিনে তাঁর এগারো বছর জেল খাটা হয়ে গেছে। অন্যদিকে নেহরু মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই বুঝে গেলেন জেল অতি বিষম বস্তু। তাঁর ধারণা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসন শুধুমাত্র নাভার আইন ভাঙার জন্য তাঁকে শাস্তি দেবে। অর্থাৎ মোটে ছ'মাস। কিন্তু পুলিশ যখন ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ আনল তখন তিনি প্রমাদ গুনলেন। কারণ এতে শাস্তির মেয়াদ বেড়ে দু'বছর হয়ে যাবে। গোড়ায় নেহরু ভেবেছিলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি কিছুই করবেন না। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তোলায় তিনি আইনজীবীর সন্ধান শুরু করেন। কিন্তু ভালো আইনজীবী পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন মোতিলাল নেহরু। তাঁরই অনুরোধে কে.ডি. মালব্য আইনজীবীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ প্রত্যাহার করে ব্রিটিশ সরকার। অধ্যাপক চমনলাল লিখেছেন, 'ভবিষ্যতে আর কখনও নাভায় আসবেন না, বন্ডে এই কথা লেখার পরেই পুলিশ জওহরলাল নেহরুকে ছেড়েছিল।' নেহরু জানতেন এই ঘটনার কথা জানাজানি হলে পরবর্তীকালে তা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। তাই আত্মজীবনীতে নাভার বিক্ষোভের কথা সবিস্তারে লিখলেও মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পাবার কথা বেমালুম চেপে গেছেন। তবে তিনি অকৃতজ্ঞ নন। স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্যাবিনেটে কে.ডি. মালব্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে তিনি ভুলে যাননি।

সাভারকর আর নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে তুলনা করতে বসলে মনে হয় কোনও তুলনাই হয় না। প্রথমজন স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য লড়াইও করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়জন স্বপ্ন দেখলেও, সেই স্বপ্ন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের চাবিকাঠির মতো। নেহরুর স্বপ্নে স্বার্থ ছিল বলেই হয়তো আজকের কংগ্রেস নেতাদের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের সামনে বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির জবাবদিহি করতে হয়। আসলে গলদটা গোড়ায়। ফুলদানিটা সোনার হলেও গোলাপটা যে প্লাস্টিকের— সেটা ভালো করে তলিয়ে দেখেনি কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের নেতারা। যার দাম এখনও তাদের নিতে হচ্ছে। □

বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রজ্ঞার সম্মেলন

গত ৩১ জুলাই বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রজ্ঞার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকে প্রথম থেকে দশম স্থানাধিকারী ছাত্রী-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া এবং ড. ইন্দ্রজিৎ সরকারের গবেষণামূলক বই 'রামায়ণী কথা, তত্ত্বে ও তথ্যে'-এর প্রকাশ করা হয়। বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ সমাজ গঠনে এবং রাষ্ট্রনির্মাণে স্বামীজীর দৃষ্টিতে ছাত্রজীবন বিষয়ে মূলাবান বক্তব্য রাখেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. সুজিত বসু স্বামী বিবেকানন্দ ও বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ড. দেবব্রত ঘোষ, লোকপ্রজ্ঞার রাষ্ট্রীয় সংযোজক জে নন্দকুমার, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মহারাজ, বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজ, ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার এবং বিশিষ্ট লেখকগণ।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন

উত্তরের সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে গত ৩০,৩১ জুলাই শিলিগুড়ি শহরের সূর্যসেন সারদা শিশুতীর্থে দুদিন ব্যাপী স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এর আগে জেলায় জেলায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়, সেই প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম স্থান অধিকার করেন তারাই প্রান্তীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমদিন উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গের রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব, সহ সভানেত্রী শ্রীমতী মণিকা সরকার, সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক। অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের ড. বিদ্যপতি আগরওয়াল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবব্রত মিশ্র। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক। আবৃত্তি, নাচ ও গানের পর শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, গাজোল, রায়গঞ্জ ও মালদহ নগরের শিল্পীরা নাটক মঞ্চস্থ করেন। শিশু নাটিকা পরিবেশন করে সারদা শিশুতীর্থের শিক্ষার্থীরা। রাষ্ট্র বন্দনার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রান্ত সভাপতি বিপ্লব দেব। ৩১ জুলাই শুরু হয় সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করেন মালদা, কলিগ্রাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ির প্রধাননগর ও ফালাকাটার প্রতিযোগীরা। উল্লেখযোগ্য হলো, গাজোল থেকে ৩৮ জন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।। শেষে পুরস্কার বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে গত ৮ আগস্ট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাজবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করেছে, তেমনই পথচারী মানুষদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে। কলেজের পড়ুয়ারা ত্রিশ বস্তা পথচারীদের যত্রতত্র ফেলে যাওয়া কাগজ, উচ্ছিষ্ট থালা-বাটি, প্লাস্টিক জলের বোতল, বিভিন্ন বর্জ্য আবর্জনা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কার করেছেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন মহিমা হাজারিকা এবং সহযোগিতা করেছেন ইগনুর ড. সুজাত দত্ত হাজারিকা ও দূরদর্শনের সুজাত মিত্র।

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের উদ্যোগে কার্গিল দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ জুলাই ব্যারাকপুর সেনানিবাসের শহিদ মঙ্গল পাণ্ডে স্মৃতি ময়দানে অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের উদ্যোগে কার্গিল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সেনানিবাসের বাসিন্দা, স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, বলিদানি সৈনিকদের বিধবা স্ত্রী এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও সেনা

আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাজ্য সভাপতি কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য, ভবা পাগলার পার্ষদ ডক্টর গোপাল ক্ষত্রী, স্থানীয় সমাজসেবী শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র। দেশাত্মবোধক গান ও 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনিতে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। বক্তব্য রাখেন কর্নেল ভট্টাচার্য ও ডক্টর ক্ষত্রী। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনির্বাণ চৌধুরী। শেষে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শান্তিভূষণ দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বহরমপুর লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন

বহরমপুর লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, নবদ্বীপ বিভাগ সঙ্ঘচালক সমর রায় , অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. জয়দেব বিশ্বাস এবং বিশিষ্ট বঙ্কিম গবেষক কিষান চাঁদ

ভকত। সংগঠন মন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগঠন মন্ত্র পাঠ করেন সহ মাতৃশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী সোহিনী চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন রবিন সেনগুপ্ত ও অচিন্ত্য চক্রবর্তী।

স্বাগত ভাষণ রাখেন গৌর চক্রবর্তী। বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দে মাতরম্ বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন কিষান চাঁদ ভকত। ভারত সরকারের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব কমিটির অন্যতম সদস্য ড. জয়দেব বিশ্বাস 'স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করে দশম শ্রেণীর ছাত্র অনিব্রত সাহা। শিশুশিল্পী দেবার্পণ দত্ত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করে।

দ্বিতীয় সত্রে বাঁশিতে দেশাত্মবোধক সুর বাজিয়ে শোনান দীপঙ্কর রায়। বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী পঞ্চানন ব্যানার্জি কবিতা পাঠ করেন। সুনীলপদ গোস্বামীর প্রেরণাদায়ী বক্তব্যের পর অঙ্কন প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। শান্তিমন্ত্র পাঠ ও পূর্ণ বন্দেমাতরম্ সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুক্তি সংগ্রামের অমৃত-দিশা গীতা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অমৃতমহোৎসব :

বর্ষব্যাপী অমৃতমহোৎসবের পূর্ণাহুতি ২০২২-এর পনেরো আগস্ট। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২০২১-এ শুরু হয়েছিল ভারতব্যাপী এই উৎসব। গত পঁচাত্তর বছরে দেশ কতটা এগিয়ে গিয়েছে, উন্নয়নের রথ কতটা মসৃণ পথে চলছে ইত্যাদির সঙ্গে দেশবাসীর নতুন করে পরিচয় ঘটানোই এই অমৃত মহোৎসবের মূল লক্ষ্য। সেই সঙ্গে দেশের বন্ধনমুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, কারাগারের ঘন অন্ধকারে দিন কাটিয়েছেন, ভোগ করেছেন বিদেশি ইংরেজ শাসকের নানা নির্মম নৃশংস অত্যাচার, স্বজন হারানোর শ্মশানের বুকে কাটিয়েছেন নিঃসঙ্গ দিনরাত— তাঁদের কথা স্মরণেরও প্রয়াস রয়েছে এই অমৃতমহোৎসব পালনের মধ্যে। যে স্বাধীনতা আজ আমরা ভোগ করছি, তা যে কেউ কৃপা করে দেয়নি, তার পেছনে যে রয়েছে অসংখ্য দেশবাসীর ত্যাগ, আত্মবলিদান— রয়েছে এক বিরামহীন দীর্ঘ সংগ্রাম। সেই মহৎ তপস্যার কথা অনুধ্যানের, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক মাহেন্দ্রক্ষণ পনেরো আগস্টের দিনটি। পঁচাত্তর বছরের এবারের দিনটি জাতির জীবনে তাই বিশেষ অর্থবহ।

দুঃখের কালরাত্রি :

ইতিহাস নামক চক্রের কাঁটাটি একটু পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিলে দেখা যাবে, ১৭৬৫-তে বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দায়িত্বহীন এক অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার আদায় করে দিল্লির মোগল বাদশাহের কাছ থেকে। সে সময় দেশের নিজামতি বা প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল অধিকারহীন নবাবের হাতে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে সেই দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেয় ইংরেজ বেনিয়ারা। নবাব হলেন কোম্পানির এক পেনসনভোগী মাত্র। ১৭৫৭-তে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যে বৃহত্তর যাত্রা তা পূর্ণতা পেল১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে। বাঙ্গলা-বিহার-ওড়িশা তথা ভারত পরিণত হলো এক ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে যে ইসলামি শাসনে দেশ ক্রমশ এক বদ্ধজলায় পরিণত হয়েছিল, সে জলায় উঠল আলোড়ন। কিছু পঙ্কোদ্ধার এবং পানা পরিষ্কারের মধ্য দিয়ে দেশে এক আপাত শান্তি। সব খোয়ানো দেশবাসীর তখনকার দাবি একটু সুশাসন, শান্তিতে দু-মুঠো নুন-ভাতে ক্ষুধা নিবারণ। স্বাধীনতার চিন্তা তখন আকাশকুসুম।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ :

ওইভাবে কেটে গেল অষ্টাদশ শতকের বাকি সময়টা। ইংরেজ একটু থিতু হয়ে১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি হিন্দুস্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চালু করল আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা। সেই শিক্ষিত একদল নব্যবঙ্গ অতীত ভুলে পাশ্চাত্যধারার তথাকথিত প্রগতির পথে উন্মত্ত পদচারণা শুরু করল। সেই সঙ্গে তাদের অনেকের মধ্যেই উন্মেষ ঘটল এক ধরনের জাতীয়তাবোধের।

জাতীয়তা, না স্বাদেশিকতা :

লক্ষ্যণীয়, এই জাতীয়তবোধের মধ্যে স্বাদেশিকতার লেশমাত্র প্রকাশ ছিল না। ইংরেজি নেশন, পাশ্চাত্য দর্শনে যে শব্দটির জন্ম মাত্র ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে— যাকে বলা হয় 'Religion of the modern World' তারই অনুকরণে ভারতেও একধরনের জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেন ইংরেজিশিক্ষিত মূলত অভিজাত সমাজ।

ভারত যে এক সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, তার জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে যে ধর্ম— তাতেই যে দেশ এক বিনিসুতোর মালায় গাঁথা, তারই মধ্য দিয়ে যে এক ধরনের জাতীয় সংহতি বর্তমান সর্বসাধারণের মধ্যে সেটা প্রায় অধরাই থেকে গেল নব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কাছে। ফলে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ মহা বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত ধর্মীয় একাত্মতার দিকে নজর না দেওয়া উচ্চবর্ণের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ঐক্যর কথা ভাবতে শুরু করলেও তা জনমনে তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

দিশা আনন্দমঠে :

এ ব্যাপারে পরিবর্তনটা এল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে। রাজনীতির মানুষ না হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি লিখলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায়। রাজনীতির কেন্দ্রে তিনি নিয়ে এলেন ধর্মকে। সেই সঙ্গে উপন্যাসে বন্দেমাতরম্ সংগীতের মধ্য দিয়ে সারা দেশকে দিলেন রাজনৈতিক মহাসংগ্রামের অভীমন্ত্র। সারা ভারতে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের সেটাই হলো মূল আওয়াজ বা স্লোগান। ভারতবর্ষের মতো বিরাট, বহু ভাষী ও বহুজাতিক দেশে এ এক মহাবিস্ময়। তাই-বা কেন, 'বন্দেমাতরম্' যে ভাবে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের মহামন্ত্র হয়ে ওঠে, বিশ্বে তার নজির মেলা ভার। বঙ্কিমচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতি না করে, কোনো ভাবেই ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত না থেকেও যেভাবে দেশকে 'বন্দেমাতরম্'-এর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করলেন তা অভিনব ও অবাক করা কাণ্ড। সত্য বা ঋত দর্শনের মধ্য দিয়েই হওয়া যায় ঋষি, বঙ্কিমচন্দ্র তপোবননিবাসীদের মতো সূত্রে হননি ঋষি। —তিনি তাঁর জীবনকালে কল্পনাও করতে পারেননি এইভাবে দেশ বা মাতৃবন্দনার অমোঘ মন্ত্র হবে 'বন্দেমাতরম্'। মুক্তি সংগ্রামীদের অমৃতাভিষিক্ত করবে এই মন্ত্র— দেবে সবরকম লড়াইয়ের অযুত নিযুত অশ্বশক্তি।

উৎসে গীতা :

বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ-মহিমায় সাহিত্য তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রে স্থাপন করলেন ধর্মকে— তার উৎস ছিল গীতা। যা এককভাবে দেখা দিয়েছে তাঁর অসমাপ্ত 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা' প্রবন্ধে। 'বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদভগবদ গীতাকে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়েছেন।' (যোগেশ চন্দ্র বাগল), সাহিত্য প্রসঙ্গ : বঙ্কিমরচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা পঁচিশ)। বিভিন্ন আলোচনায় বোঝা যায়, গীতায় আত্মস্থ বঙ্কিম ভবিষ্যতের মুক্তি সংগ্রামীদের পথের দিশা হিসেবেই 'আনন্দমঠে' প্রকাশ করেছিলেন তাঁর উপলব্ধি।

বঙ্কিম-পরবর্তী বিবেকানন্দও একই ভাবে গীতার সর্বজনীন দর্শন ও মতার্দশের কথা প্রচার করে গেছেন। ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম মহাসভার প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনার প্রতি উত্তরে বলেন, 'এই ধর্মমহাসভা গীতা প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড পৃ. ৮)। বিবেকানন্দর জীবনসাধনার অনেকটা জুড়েই ছিল গীতা। তাই গীতার কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি অধ্যায়গুলিকে আত্মস্থ করে নিজস্ব বিশ্লেষণে যে প্রশ্নগুলি লিখেছিলেন, তা ছিল বিশেষ করে বঙ্গের বিপ্লবীদের মানসিক গঠন, বৈপ্লবিক শক্তি অর্জন এবং আত্মবলিদানের বোধ দৃঢ়ীকরণের অন্যতম অস্ত্র। বিবেকানন্দের এইসব গ্রন্থ পাঠ করেই অসংখ্য তরুণ-যুবক পার্থিব সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কেবল বিপ্লবীরা নন, আরও অসংখ্য মানুষকে মুক্তি-সৈনিক তৈরি করেছিল বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনা এবং গীতা সম্পর্কে তাঁর সুগভীর ভাবনা। বস্তুত ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে দৃঢ় বুনিয়াদটি গড়ে উঠেছিল গীতা এবং এইসব রচনা পাঠের মধ্য দিয়ে।

মুক্তি সংগ্রামের সূচনা :

ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্পর্শ করেছিল তিনটি শতককে। অষ্টাদশ শতকে এই শাসনের সূচনা, ঊনবিংশ শতকে সারা ভারতে রাজ্যবিস্তার এবং ব্রিটিশ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর বিশ শতকে ভারত ছেড়ে ব্রিটিশদের প্রস্থান। স্বাধীনদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে উঠল ভারতের নাম।

এই যে তিন শতক ছোঁয়া ইংরেজ শাসন, তার প্রথম শতকে বস্তুত কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি সাধারণের মনে। কেননা, সাধারণ মানুষ জানতো, দেশের রাজা বদল হয় কিন্তু তাদের শোষিত হওয়ার দুর্ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। স্বাভাবিক ভাবে, ইংরেজ শাসনের শুরুতে দেশ অরাজকতার অন্ধকার পার হয়ে যেটুকু শান্তির আলো পেয়েছিল তাতেই তুষ্ট ছিল জনগণ। শাসকের শোষণের বাইরে তোপবাজি বা ধন ও জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে যে আর ভাবতে হচ্ছে না এতেই খুশি ছিল মানুষ।

দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে সবরকম সৃজন বন্ধ করে একটি জাতিকে 'মজদুরে' পরিণত করার প্রয়াস সার্থক হয় ইংরেজ শাসনের প্রায় শুরুতেই। সেই সঙ্গে ইংরেজের কূট অর্থনৈতিক কৌশলে গজিয়ে ওঠা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও হঠাৎ ধনীরা হয়ে ওঠে সমাজপতি। তাদের বিধানে জনশোষণ হলো ঈশ্বরের অভিশাপ বা জনগণের দুর্ভাগ্য। অন্যদিকে শাসক ইংরেজদের তোষামুদি করে তাদেরই বসানো জগদীশ্বরের আসনে ওই নতুন গজিয়ে ওঠা শ্রেণী। তবুও লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসর ঘরেও থেকে যায় ছিদ্র। ইংরেজ যে ইংরেজি শিক্ষাধারার প্রবর্তন করে তারই ছিদ্রপথ দিয়ে নবশিক্ষিতরা ইংরেজ শাসনে নিজেদের বঞ্চিত মনে করেও রাজানুগ্রহ পাওয়ার জন্য ইংরেজি ধাঁচে বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে জোট বেঁধে একধরনের আন্দোলন শুরু করে।

ঊনবিংশ শতকে ইংরেজের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই জনজাতিরা বিদ্রোহ শুরু করে। কিন্তু একদিকে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, অন্যদিকে ইংরেজের আধুনিক অস্ত্র ও রণকৌশল, নবোদ্ভূত ও নবশিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরোধিতায় ব্যর্থ হয় তাদের সেই বিদ্রোহ। ১৮৫৭-তে যে মহাবিদ্রোহ ঘটল তাও ছিল জনবিচ্ছিন্ন। সেখানেও দেশীয় রাজশক্তি, মধ্যবিত্ত ভারতবাসী এবং ইংরেজের আধুনিক অস্ত্রের কাছে হার মানলেন সংগ্রামীরা। অবশ্য, এরফলে হলো দৃশ্যান্তর। ভারত চলে এলো সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনে। অবসান হলো কোম্পানির শাসন।

আন্দোলনের দ্বিতীয়ধারার দিকে :

অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে জাতির অন্তরে ধীরে ধীরে জারিত

হতে থাকে স্বাজাত্যবোধ। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের মায়া এড়াতে নাা পারলেও স্বদেশকে ফিরে দেখা, স্বদেশ প্রেম জাতির একটি অংশের মানসলোককে আলোকিত করতে থাকে। খুব সীমিত হলেও সেটাই হয়েছিল সন্ধেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর জন্য সকাল বেলায় তৈরি সলতে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসকের প্রচ্ছন্ন মদত ও প্রেরণার প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বভারতীয় সংস্থা জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু তার নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজ অনুগত উচ্চবর্ণ ও সমাজের ক্ষীর-খাওয়া ওপর তলার মানুষ। ফলে তাদের সঙ্গে প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের অন্তরের কোনো যোগই ছিল না। তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা শীতের বনভোজনের মতো বছরে একবার মিলিত হয়ে বক্তৃতায় নিজেদের ইংরেজি জানার জ্ঞানগরিমার কথা সরবে প্রকাশ করে শাসকের কাছে প্রায় নতজানু ভিক্ষুকের মতো আরও কিছু বাড়তি অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন করত। দেশের স্বাধীনতার চিন্তা সেসময় তাঁদের মাথাতেও ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে থাকলে তাকে সক্রিয়ভাবে চাপা দিয়ে রাজানুগত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিলেন বেশিরভাগ নেতা।

অবস্থার বদল ঘটতে থাকে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে। এবং আশ্চর্যভাবে অথবা এক অনিবার্য এবং অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে ভারতের আদি ধর্মবোধের উৎস— গীতার প্রভাবে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন জনমনে মূর্ত হতে থাকল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। জীবন তুচ্ছ করে মাতৃ অর্চনায় জীবন বলিদানের এক বোধ দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে ভারত-অন্তরে। আর তারই প্রথম প্রকাশ ঘটল মহারাষ্ট্রে। প্রায় সকলের অজান্তেই বিপ্লববাদের বীজটি অঙ্কুরিত হয় সেখানে।

মুক্তি সংগ্রামের দ্বি-বেণী :

ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ধারাটি বইতে থাকে গঙ্গা-যমুনার মতোই। পরবর্তীকালে সংগ্রামের মূলধারাটি অহিংসা-সত্যগ্রহপন্থী গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের হাতে চলে গেলেও দেশের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে কিন্তু তার আপন মানস-সম্পদেই বইতে থাকে প্রায় সমান্তরালভাবে। শেষ পর্যন্ত সে ধারার 'ভগীরথ' হয়ে ওঠেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। অন্তরীন অবস্থায় সংগোপনে দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্বভার তুলে নিয়ে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালান, আপাতদৃষ্টিতে তা সফল হয়নি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা মনে করেন মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর ওই ভূমিকা, যুদ্ধোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতি ও নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদির মতো ঘটনাই ব্রিটিশকে এদেশ ছাড়তে বাধ্য করে। এইসব আন্দোলনেরই যোগফল ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা।

দেখা যাচ্ছে দেশের বিপ্লবী আন্দোলন এবং তথাকথিত অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁদের আন্দোলনস্পৃহার মূল শক্তিটি অর্জন করেছিলেন গীতা থেকেই। গীতা তাঁদের কাছে নিছক একটি ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে হয়ে ওঠে জীবন বেদ। গীতার মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পান অনুপ্রেরণা, সর্বস্ব ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের ঋত্বিক হওয়ার শক্তি এবং শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দিশা।

গীতা অনুধ্যান :

এই বিষয়ে বিশদে যাওয়ার আগে বরং শোনা যাক গীতা সম্পর্কে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের কয়েকজন অগ্রপথিকের কথা। আধুনিক যুগে যাঁরা গীতার ভাষ্য লেখেন তাঁদের অন্যতম বালগঙ্গাধর তিলকই (১৮৫৬-১৯২০) প্রথম বলেন, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। তৎকালীন বর্মার মান্দালয় জেলে বন্দি থাকার সময় তিনি লেখেন 'গীতারহস্য' নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি। গীতার বিভিন্ন বক্তব্য বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন, কর্ম ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তিনি বলেন, গীতা হলো সংগ্রামের মন্ত্র। বলেন, কর্মই গীতার কর্মবিন্দু। মুখ্য উদ্দেশ্যও এই কর্মযোগ। লেখেন গীতা ভারতীয়দের সব প্রেরণার উৎস। জাতির ভাগ্য নির্ণয়, আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছে গীতা। চরমপন্থী তিলকের মতো মান্দালয় জেলে অটক থাকার সময় বিপ্লবী নেতা লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) লেখেন 'দি মেসেজ অব দি ভগবত গীতা'। তাঁর ওই গীতাভাষ্যটি প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। এখানে গীতার বিভিন্ন বক্তব্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, জীবন হলো একটা আদর্শ এবং সেই আদর্শ পালন করাই হলো ধর্ম। গীতা জীবনের সবক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক। কারাগারে গীতার মধ্যেই তিনি পেয়েছেন সান্ত্বনা। তাঁর মতে গীতার আদর্শে মুক্তমনে মুক্তি সংগ্রামে বিরোধী শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। মহিলাদের মধ্যে প্রথম ইংরেজিতে গীতাভাষ্য লেখেন অ্যানি বেশান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)।

বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম হোতা অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) সাত বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করে ১৮৯৩-এ ভারতে ফিরে আসেন। তারপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন মুক্তি সংগ্রামের এক সমর্থ সেবানায়ক। নতুন করে ভারত সংস্কৃতির উৎসে যান তিনি। গীতার সঙ্গে পরিচয় হয় গভীর। আর তারই সূত্রে তাঁর উপলব্ধি, গীতার আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

অরবিন্দ এবং তাঁর অনুগামীরা সকলেই নিজেদের তৈরি করেছেন গীতার আদর্শে। বিশেষ পরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকগুলি ছিল অরবিন্দ এবং বিপ্লবীদের মর্মবাণী, রক্তের সম্পদ। এই সম্পদে ঋদ্ধ অরবিন্দ মনে করতেন গীতার মহাবাক্যগুলি অনুসরণ করে, সবরকম 'ক্লৈব্য'— বৈকল্য, অবসাদ সরিয়ে একজন দৃঢ় লক্ষ্য যোদ্ধা হওয়া সম্ভব। অরবিন্দর স্থির বিশ্বাস, গীতা কোনো দ্বন্দ্বমূলক সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। গীতা হলো বিশ্ব-দর্শনের একটি দর্পণ। এটি এক মুক্তদর্শন। এই দার্শনিক বোধেই তিনি নাসিকের প্রেক্ষাগৃহে জ্যাকসনের হত্যা, লন্ডনের সভাগৃহে উইলি কার্জনের নিধন, জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে গুলি করে খুন করেন যাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানান দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। বিপ্লবীদের এই নিধন-নীতির সঙ্গে তিনি যে সম্পূর্ণ একমত তার প্রকাশ হয়েছে ১৯১০-এর ২৪ জানুয়ারি হাইকোর্টের সিঁড়িতে বিপ্লবী বীরেন দত্তগুপ্তের গুলিতে পুলিশকর্তা সামসুল আলমের নিহত হওয়ার ঘটনায়। ঘটনাটির দিন পরে তিনি তাঁর 'কর্মযোগিন' কাগজে দেখেন, 'Boldest of the many bold acts places and crowded buildings— Nasik-London-Calcutta— Goswami in jail— These are remarkable features.' (গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলার স্বদেশি যুগ। পৃ. ৮৬)।

বিপ্লবের মহামন্ত্র :

বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সময়কাল প্রায় পঞ্চাশ বছর— ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালে বিপ্লবীরা 'জীবনমৃত্যু

পায়ের ভৃত্য' মন্ত্রে সিদ্ধ গীতা-চর্চার মধ্য দিয়ে। এইসব বিপ্লবীকে তৈরি করা হতো প্রায় বালক বয়স থেকে। ওই সময় তাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো গীতা। সেই গীতাপাঠের মধ্য দিয়ে তাঁরা হতেন এক একটি খাপখোলা শাণিত জ্বলন্ত তরবারি। তাঁরা হতেন স্থিতধী— বুঝতেন আত্মা অবিনশ্বর। তাঁকে অস্ত্র দিয়ে খণ্ডিত করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না। তাকে হত্যা করাও যায় না। মৃত্যু হলো জীর্ণবসনের মতোই এক দেহ ছেড়ে আত্মার নববস্ত্রে সজ্জিত একটি নতুন দেহকে আশ্রয় করার ঘটনা। এই বোধেই মুক্তিযুদ্ধের এই সেনানীরা ছিলেন সংশপ্তকদের মতো আত্মবলিদানে উৎসুক এক একজন অগ্নি পুত্র। নিষ্কামকর্মে বিশ্বাসী এই বিপ্লবীরা ছিলেন দেশমাতৃকাকে মুক্তির রক্তজবার মালায় সাজাবার সুখস্বপ্নে মগ্ন। তাঁরা নিজেদের মনে করতেন অর্জুনের হাতের গাণ্ডীব। কুরুক্ষেত্রের অর্জুন হওয়া ছিল তাঁদের সংকল্প। গীতার বাণীর প্রকৃত উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাঁরা হতে চাইতেন অর্জুনের মতোই সব্যসাচী।

গীতা হাতে ফাঁসির মঞ্চে :

বঙ্গে বিপ্লবাত্মক পথ নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয় মোটামুটি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে আন্দোলনের সময় থেকে বেড়ে যায় বিপ্লবাত্মক কাজ। ১৯০৮-এ কুখ্যাত বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য মজফ্ফরপুরে যান তরুণ প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু। কিংসফোর্ডের বদলে ভুল করে তাঁরা বোমায় খুন করেন দুই নিরীহ ইংরেজ নারীকে। ধরা পড়ার আগেই আত্মঘাতী হন প্রফুল্ল চাকী। ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯০৮-এর ১১ আগস্ট হসিমুখে ফাঁসিতে প্রাণ দেন ক্ষুদিরাম। সে সময় তাঁর হাতে ছিল গীতা।

এরপর থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন বিপ্লবীরা। বিপ্লবীদের অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তরের সদস্য পদ নিতে হতো গীতা হাতে শপথ নিয়ে। গীতাপাঠের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তি অর্জন করতেন বিপ্লবীরা। ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অত্যাচারী ইংরেজ ও তাদের সহযোগীদের হত্যা করে ফাঁসিতে প্রাণ দেন কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, চারু বসু, বীরেন দত্তগুপ্তের মতো কিশোর-তরুণ। গীতার শিক্ষায় আত্মস্থ এই বিপ্লবীরা প্রত্যেকেই ফাঁসির মঞ্চে ওঠেন গীতা হাতে নিয়ে যা স্তম্ভিত করে সাদা চামড়ার ইংরেজদেরও।

বস্তুত, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিটি যোদ্ধাই ছিলেন গীতার মন্ত্রে দীক্ষিত। বাঘাযতীন থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ দাস সকলেই জীবন গড়েছিলেন গীতার মন্ত্রে।

অন্য রাজ্যেও :

কেবল বঙ্গপ্রদেশ নয়, সারা ভারতের বিপ্লবীদেরই এক একটি অগ্নিশিশুতে পরিণত করে গীতা। বঙ্গপ্রদেশের বাইরে সিন্ধুপ্রদেশে বিপ্লবীদের সরকারি অস্ত্র পাচার করার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় হেমু কালানিকে (১৯২৩-১৯৪৩)। কুড়ি বছরের তরুণ হেমু গীতার শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসির মঞ্চে ওঠেন। তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ যখন ঝুলছে তখনও হাতে রয়েছে গীতা। একইভাবে মদনলাল ধিংড়াকেও (১৮৮৩-১৯০৯) অনুপ্রাণিত করে গীতা।

গীতার আদর্শে জীবন গড়ে ইংরেজের ফাঁসির মঞ্চে এক বছরের মধ্যে ফাঁসিতে প্রাণ দেন তিন চাপেকর ভাই। মহারাষ্ট্রে মহামারী প্লেগের প্রকোপ দেখা দেয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানের করোনার মতোই মহামারীর রূপ নেয় প্লেগ। সে সময় প্লেগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নামে পুণের ঘরে ঘরে গিয়ে অত্যাচার শুরু করেন প্লেগ কমিশনার ডব্লুউ সি র‍্যান্ড। ধর্মে আঘাত এবং গৃহস্থের সম্ভ্রম নষ্ট করার জন্য দোষীদের হত্যা করার দায়িত্ব নেন চাপেকর ভাইরা। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন তাঁদের গুলিতে নিহত হয় অত্যাচারী র‍্যান্ড ও তাঁর দেহরক্ষী লে: আয়ার্স্ট। ধরা পড়েন দামোদর হরি চাপেকর (১৮৬৯-১৮৯৮), বালকৃষ্ণ হরি চাপেকর (১৮৭৩-১৮৯৯) এবং বাসুদেব হরি চাপেকর (১৮৮০-১৮৯৯)। বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে দামোদরকে ১৮৯৮-এর ১৮ এপ্রিল পুণের যারবেদা জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির মঞ্চে তাঁর হাতে ছিল বালগঙ্গাধর তিলকের পাঠানো গীতা। একইভাবে পরের বছর ৮ মে এবং ১২ মে ফাঁসি হয় যথাক্রমে বাসুদেব ও বালকৃষ্ণের।

শুধু তিন ভাই নয়, তাঁদের পরিবারটিই ছিল বিষ্ণুভক্ত গীতাপাঠী। চাপেকর ভাইদের মৃত্যুর পর নিবেদিতা পুণেতে গিয়ে দেখা করেন চাপেকর ভাইদের মায়ের সঙ্গে। দেখেন নারায়ণের পায়ে সবকিছু সমর্পণ করে গীতার মন্ত্র সুখে-দুঃখে নির্বিকার থাকার শিক্ষার তিনি তাঁর সব শোককে অতিক্রম করে এক স্থিতধী নারীতে পরিণত হয়েছেন। বিস্মিত নিবেদিতা সেই মহিয়সী জননীকে প্রণাম করে বিশুদ্ধ অন্তরে উপলব্ধি করেন গীতার মন্ত্র মাহাত্ম্য। অনুভব করেন গীতার শক্তি।

এইসব বীর বিপ্লবীদের মতোই নেতাজী সুভাষচন্দ্রও ছিলেন গীতাপাঠী। ভক্তি ও শক্তির দীক্ষা নেন তিনি গীতা থেকেই। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে অভিযানের সময়ও তিনি নিয়মিত গীতা পড়তেন।

অংহিস সত্যগ্রহেরও মূলমন্ত্র :

বিপ্লবী আন্দোলনের মতো কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল গীতা। এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন গীতার নিষ্কাম কর্মই আত্মোন্নতি ও স্বাধীনতার পথ। গান্ধীজীর ধারণায়— গীতা বিশ্বজননী। কাউকে ফেরান না গীতা। গান্ধীজী সবসময় বলতেন অনাসক্ত যোগের কথা। বলা যায়, গীতা ছিল তাঁর জীবনসঙ্গী। হতাশা, ব্যর্থতার সময় গীতায় সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন তিনি।

গীতাই শক্তি সর্বশক্তি :

এইভাবে বলতে হয় গীতা সুগীতা। গীতা ভারতের চিরকালের জীবনবেদ। অনাদিকাল থেকেই ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে গীতা। মুক্তি সংগ্রামে যেমন, তেমন প্রত্যেকের জীবনেও গীতার প্রভাব সর্বব্যাপী। শুধু এদেশে নয়, বিশ্বের সর্বত্রই। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ভাষায় তাঁর সব প্রেরণা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনে রয়েছে গীতার ভূমিকা। কেবল আইনস্টাইন নন, তাঁরই মতো অ্যালডাস হাক্সলে, জেরকট ওপেন হাইমার, হেরম্যন বেস, ইলিয়ট দানগামরিশিল্ড প্রমুখ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, রাজনীতিকরাও নানা প্রসঙ্গে গীতার কাছে তাঁদের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। আর এই ভাবেই গীতা হয়েছে বিশ্ব বিবেক বা চেতনার প্রতীক।

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অবিলম্বে শুরু করা হোক

শ্রীরাধা

গত ১১ জুলাই আরও একটা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হলো। এমন তো প্রায় রোজই কোনো না কোনো দিবস সারা বছর ধরে পালন করা হয়। কিন্তু আমরা কজনই-বা তা মনে রাখি। আসলে মনে রাখার মতো তেমন কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাই না। কিন্তু এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফ থেকে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা কিন্তু ভারতবাসীর সামনে এক অশনিসংকেত। আগামী ভারতের ছবিটার দিকে একটু চোখ রাখলেই বোঝা যাবে জনসংখ্যা আমাদের কীভাবে শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে ২০২২ সালে অর্থাৎ বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৬০ লক্ষ আর ভারতবর্ষের ১৪১ কোটি ২০ লক্ষ। কিন্তু সব থেকে শঙ্কার কারণ, আগামী বছরই, ২০২৩ সালের মধ্যেই ভারত চীনকে পিছনে ফেলে পৃথিবীতে এক নম্বর স্থানে উঠে আসবে। যার সোজা মানে গিয়ে দাঁড়াল কিছুদিনের মধ্যেই ভারত জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হতে চলেছে। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে আগামী ভারতবর্ষের আগাম ছবি। সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি সামনের দিনে ভারতবর্ষ কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

খুব বেশিদিনের কথা নয়। তখন যেসব অঞ্চল ছিল প্রায় জনশূন্য, সেখানে আজ কেবল নতুন নতুন বসতি। শুধুই ইমারতের জঙ্গল। যেদিকে চোখ যায় কেবলই মানুষ আর মানুষ। মানুষ-জমির ঘনত্ব ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। ফলে টান পড়েছে বসত জমিতে। ব্যক্তি মালিকানার বাড়ি আজ লুপ্তপ্রায়। মানুষের মাথা গোঁজার সংকুলানের জন্য বহুতলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শহর বিস্তৃত হয়ে দিন দিন গ্রামকে গ্রাস করছে। চাষের জমি ক্রমেই কমে আসছে। কোথাও বসতি, আবার কোথাও এই বর্ধিত জনসংখ্যার কথা ভেবে ওইসব জমিতে শিল্প তৈরি হচ্ছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মুখে অন্ন জোগাতে জমিতে অধিক ফলনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে। এই রাসায়নিক সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার যে জমিকে বন্ধ্যাত্বের দিকে নিয়ে যাবে তা জেনেও কিছু করার থাকছে না। সুতরাং একটা সময় দেশের এই বিপুল জনসংখ্যার অন্ন জোগানে যে সমস্যা দেখা দেবে না তা কে বলতে পারে।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জোগানের থেকে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় চারিদিকে যেন একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি। সন্তানদের স্কুলে ভর্তি থেকে চাকরি সব ক্ষেত্রে এক ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে মানুষের হাতে কলমে কাজের প্রয়োজনীয়তা কমেছে। সংকুচিত হয়েছে কর্মক্ষেত্র। ইদানীং অর্থনীতির একটা অদ্ভুত তথ্য বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অধিক জনসংখ্যা নাকি অর্থনৈতিক উন্নতির একটা অন্যতম প্রধান সহায়ক। যেখানে উৎপাদন এখন শ্রমিক নির্ভরই নয়, সম্পূর্ণ যন্ত্র নির্ভর— সেখানে এই তথ্য কি হাস্যকর নয়? এমন অবস্থায় দিনকে দিন জীবন জটিল হতে হতে যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই বর্তমানে দেশ ও সমাজের অন্যতম মূল শত্রু হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতা থেকে বুদ্ধিজীবীরা একেবারে চুপ। পৃথিবীর নমস্য অর্থনীতিবিদরা কি জানেন না ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি? ভারতবর্ষের উন্নয়নে জনসংখ্যা যে প্রধান শত্রু তা বুঝতে তো অর্থনীতির পণ্ডিত হতে হয় না। সমাজের এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এবং দেশের বিরুদ্ধাচারণ করা অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত ভারতের ক্ষুধার সূচক, বেকারত্বের সূচক, অর্থনৈতিক অবনমনের সূচক নিয়ে গলা ফাটান। বিদেশের নানা প্রান্তে এনআরসি, কৃষক আন্দোলন, সিএএ এবং দেশের অসহিষ্ণুতা নিয়ে সমালোচনা করে বেড়ান। কিন্তু ভারতবর্ষের জনবিস্ফোরণ নিয়ে সরকারের সমালোচনা তো দূরের কথা বিশ্বের কোথাও একটা কথাও উচ্চারণ করেন না। এই সবজান্তা ধুরন্ধর গোষ্ঠী কিন্তু বিলক্ষণ জানেন দেশের অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার বাড়বাড়ন্তের পিছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এক অদৃশ্য হাত রয়েছে। জীবন সংগ্রাম যত বাড়বে সমাজে অস্থিরতাও ততই বাড়বে। আসলে এই মহামানবরা সত্যের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান। ভয় পান সেই সব ধর্মীয় মাতব্বরদের যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেশ দখল করতে চায়। ধ্বংস করতে চায় ভারতবর্ষকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একান্ত আবেদন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আর আবেদন-নিবেদন নয়। এই দেশবিরোধী বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় মাতব্বরদের যৌথ চক্রান্ত ধ্বংস করতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চরম পদক্ষেপ নেওয়া হোক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে আগামীদিন কিন্তু ভারতবর্ষকে চরম মূল্য দিতে হবে।

□

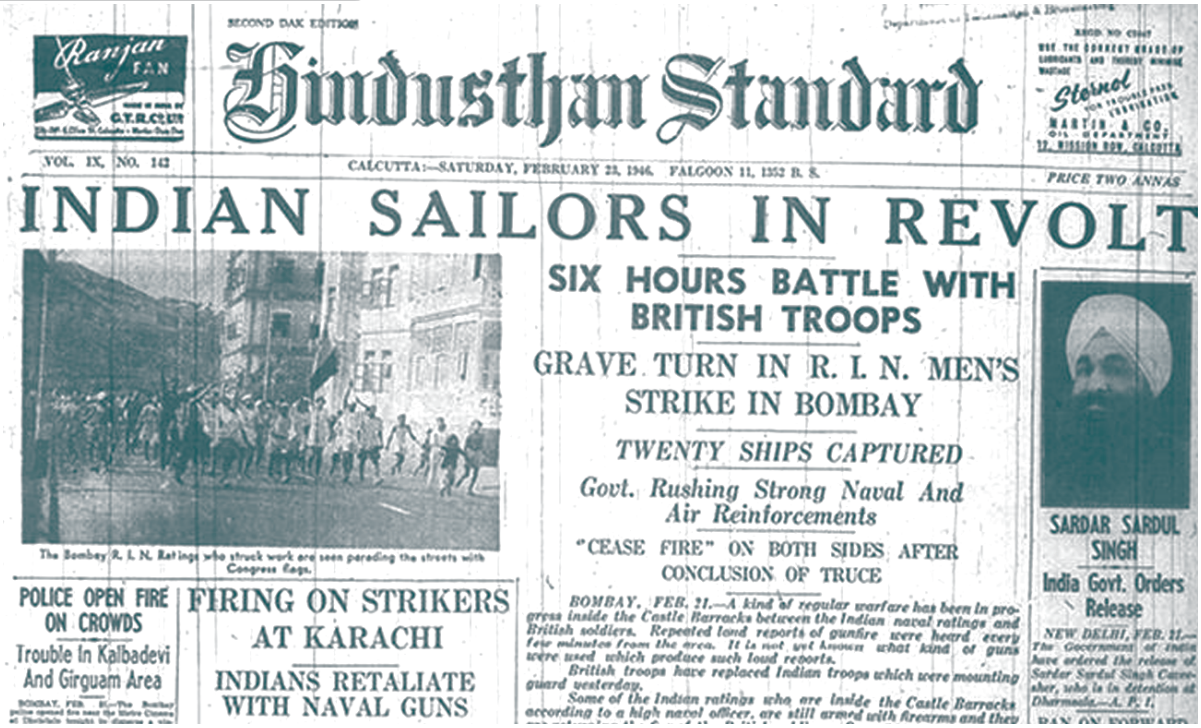

SECOND DAK EDITION

Ranjan TAN

Hindusthan Standard

VOL. IX, NO. 143 CALCUTTA:—SATURDAY, FEBRUARY 23, 1946. FALGOON 11, 1352 B. S. PRICE TWO ANNAS

Sternol

INDIAN SAILORS IN REVOLT

The Bombay R. I. N. Ratings who struck work are seen parading the streets with Congress flags.

SIX HOURS BATTLE WITH BRITISH TROOPS

GRAVE TURN IN R. I. N. MEN'S STRIKE IN BOMBAY

TWENTY SHIPS CAPTURED

Govt. Rushing Strong Naval And Air Reinforcements

"CEASE FIRE" ON BOTH SIDES AFTER CONCLUSION OF TRUCE

BOMBAY, FEB. 21.—A kind of regular warfare has been in progress inside the Castle Barracks between the Indian naval ratings and British soldiers. Repeated loud reports of gunfire were heard every few minutes from the area. It is not yet known what kind of guns were used which produce such loud reports.

British troops have replaced Indian troops which were mounting guard yesterday.

Some of the Indian ratings who are inside the Castle Barracks according to a high naval officer, are still armed with firearms and their

POLICE OPEN FIRE ON CROWDS

Trouble In Kalbadevi And Girgaum Area

FIRING ON STRIKERS AT KARACHI

INDIANS RETALIATE WITH NAVAL GUNS

SARDAR SARDUL SINGH

India Govt. Orders Release

NEW DELHI, FEB. 21.—The Government of India have ordered the release of Sardar Sardul Singh Caveesher, who is in detention at Dharmsala.—A. P. I.

ভারতের নৌবিদ্রোহ এগিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তি

স্বপন দাস

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে বলা হয়ে থাকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সার্বিকভাবে প্রথম লড়াই বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন। সেরকম ১৯৪৬ সালের ভারতের নৌ বিদ্রোহকে বলা হয়ে থাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ যুদ্ধ।

সারা বিশ্ব তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণে টালমাটাল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ রয়েল ইন্ডিয়ান নেভির 'তলোয়ার' নামের জাহাজে নিম্নমানের খাদ্য ও জাতীয় অবমাননার প্রতিবাদে নৌ-সেনারা ধর্মঘট শুরু করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নৌবাহিনীর জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ চলছিল। এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। এই সব সংগৃহীত সৈন্যদের প্রতি তখন চলছিল নানা রকমের অত্যাচারের সঙ্গে নানারকম অবমাননাকর পরিস্থিতি। এই অবমাননা ও প্রহসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন নাবিকেরা। শুরু হয় ধর্মঘট। বেশ কয়েকটি কারণ এর পিছনে লুকিয়ে ছিল। (১) ব্রিটিশ কর্মচারীদের খুব খারাপ ব্যবহার, তারা অপমানের সঙ্গে করত গালিগালাজ, (২) নৌবাহিনীতে ছিল বর্ণ বৈষম্যের এক চূড়ান্ত প্রকাশ। ইংরেজ শ্বেতাঙ্গ সেনারা ভারতীয় সেনাদের কালোচামড়া বা কৃষ্ণাঙ্গদের একেবারে নীচু জাত হিসেবে গণ্য করত। আর ভারতীয় সেনাদের ঘৃণার চোখে দেখত। (৩) বেতন বৈষম্য ছিল খুব। বেশি কাজ করেও ভারতীয় সেনারা বেতন পেতেন একজন ব্রিটিশ সেনার থেকে অনেকটাই কম। (৪) নিকৃষ্ট মানের খাদ্য সরবরাহ ছিল অন্যতম প্রধান একটি কারণ। এবং বহুবার এটি নিয়ে বলতে গেলে জুটত চরম অপমান। আর এই সমস্যার কোনোদিনও সুরাহা হয়নি। (৫) ভারতীয় নাবিক বা সেনাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। ছিল না চাকরি শেষ হয়ে যাবার পর পেনসনের সুবিধা। (৬) এরপর ছিল চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবার একটা প্রক্রিয়া। যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর চাকরি থেকে বেছে বেছে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় ভারতীয়দের।

নৌবাহিনীর এই ধর্মঘটে ১৫ হাজার শ্রমিক যোগ দেন। ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি, নৌ-বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে দিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের পতাকা তুলে দেন জাহাজে। তারা একযোগে আওয়াজ তোলেন 'ভারতমাতা জিন্দাবাদ', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। নৌ বিদ্রোহীরা এরপর এস.এন.রয়-কে সভাপতি এবং মানসিংহকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করে একটি কমিটি গঠন করে ফেলেন। তলোয়ার জাহাজের রেডিয়ো অপারেটর বলাই দত্ত নানা স্লোগান তোলেন, 'ইনকিলাব for mata', 'British Quit India', 'বন্দেমাতরম্', জয় হিন্দ্ ইত্যাদি। এই অপরাধে নৌ কর্তৃপক্ষ বলাই দত্তকে বরখাস্ত করে। এই বরখাস্তের প্রতিবাদে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির প্রধান এম.এস. খানের নেতৃত্বে ১৫০০ নাবিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের ২২টি জাহাজে এবং করাচির হিন্দুস্থান জাহাজে এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নৌ-বিদ্রোহে যোগ দেয় বোম্বাইয়ের প্রায় সমস্ত রণতরী এবং বারোটি জাহাজের নাবিকেরা। বোম্বে থেকে প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহের সূচনা হলেও পরবর্তীতে পুরো ব্রিটিশ শাসিত ভারত জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহে করাচি ও কলকাতা থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত মোট ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীরবর্তী

প্রতিষ্ঠান এবং ২০ হাজার নৌবাহিনীর নাবিক এই আন্দোলনে যুক্ত হয়।

ধীরে ধীরে নৌবিদ্রোহ বোম্বাই ছাড়িয়ে মাদ্রাজ ও কলকাতা বন্দরের ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাই বন্দরের সমস্ত জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য পদাতিক বাহিনী পাঠায়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সাতদিন ধরে চলে এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনারা জয়লাভ করে। নৌবিদ্রোহীদের এই জয়লাভকে ভালো চোখে দেখল না ব্রিটিশ সরকার। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এরপর ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল গডফ্রে বোমারু বিমানে চেপে ঘটনাস্থলে এলেন। হুঁশিয়ারি দিলেন বিদ্রোহীদের ধ্বংস করার। কিন্তু এই হুঁশিয়ারিতে নৌবিদ্রোহীরা ভয় না পেয়ে তাদের বিদ্রোহকে সমর্থন করার জন্য ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানান। তাদের সেই আহ্বানে সাড়া দিল বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট পার্টি। তারা ধর্মঘটের ডাক দিল। এই ধর্মঘটে প্রায় ২৩ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করল। পুলিশের সঙ্গে ধর্মঘটীদের সংঘর্ষ হয়। বিদ্রোহীরা দাবি করেন যে ভারতের আজাদহিন্দ ফৌজের বিচার স্থগিত রাখতে হবে এবং অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবি সমেত একাধিক দাবি সামনে আনতে থাকেন।

নৌ বিদ্রোহ ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকলে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। নৌবিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের একটি প্রস্তাব দেন আর এই আশ্বাস দেন যে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে জাতীয় কংগ্রেস তাদের স্বার্থ রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। অন্যদিকে গান্ধীজীর একটি মন্তব্যে নৌবিদ্রোহীদের মনে সামান্য হলেও ব্যথা লাগে। শেষে বল্লভভাই প্যাটেলের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলেন যে 'আমরা ভারতবাসীর কাছে আত্মসমর্পণ করছি, ব্রিটিশদের কাছে নয়।' নৌ বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ নৌবিদ্রোহীদের জাহাজগুলিকে ঘিরে ফেলে নৌবিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে এবং সমস্ত আটক ভারতীয় নৌসেনাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে থাকে। নৌবিদ্রোহীদের নেতা এস.এস. খানের পায়ে পাথর বেঁধে তাকে আরব সাগরে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে এক করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে এই বিদ্রোহের।

এই নৌবিদ্রোহের ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক জরুরি বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠকে তিনি বলেছিলেন— 'সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়।' তারা গুরুত্ব দেন অন্যদিকে। তারা মনে করতে থাকেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারত থেকে শাসনভার গুটিয়ে ফেলার। নৌবিদ্রোহের ফলে ভারতকে স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত নিতে ব্রিটিশরা একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিকরা। এর পিছনে অন্য একটি যুক্তিও তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। 'ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন'-এর সূচনাকে তারা আনেন এই যুক্তির কারণ হিসেবে। আর তার ফলেই অনেকে মনে করেন এই নৌবিদ্রোহের জন্যই ব্রিটিশ প্রশাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটাই বাধ্য হয়েছিল।

LARGEST NET SALES of any Daily Newspaper Printed in Northern, Southern, Central and Western India. REGD. No. B 111

The Times of India

ESTABLISHED 1838

NO. 196. VOL. CIX. BOMBAY: MONDAY, AUGUST 18, 1947 PRICE TWO ANNAS

PUNJAB & BENGAL BOUNDARY AWARD ANNOUNCED

No Agreed Solution: Wide Divergence Of Opinion

ASSENT TO CHAIRMAN'S OWN DECISION

Demarcation Of Borders Of Divided Provinces

NEW DELHI, August 17.

THE award of the Punjab and Bengal Boundary Commissions, presided over by Sir Cyril Radcliffe, was announced today.

Sir Cyril Radcliffe says in his reports to the Governor-General that in the course of the Commissions' discussions "the divergence of opinion among my colleagues was so wide that an agreed solution of the boundary problem was not to be obtained."

In those circumstances, says Sir Cyril, his colleagues, at the close of their discussions, assented to the conclusion that he must proceed to give his own decision.

As the result of the award of the Punjab Boundary Commission, the province of the West Punjab will include the whole of the Multan and Rawalpindi divisions, and the districts of Gujranwala, Sheikhupura and Sialkot of the Lahore division.

The province of the East Punjab will include the whole of the Jullundur and Ambala divisions, and the Amritsar dis-

Sir Cyril Radcliffe.

BORDER AWARD CONDEMNED

Pakistan Reaction

"MOST UNFAIR & UNJUST"

KARACHI, August 17.

Bitter comments on the Boundary Commission award were made in Ministerial circles of the Pakistan Government this evening.

The Communication Minister, Sardar Abdur Rab Nishtar, said: "It is extremely unfair and unjust to

British Crisis Talks

CABINET MEETS

Vital Decisions On Relief

LONDON, August 17.

MR. Attlee broke his holiday and drove to London from North Wales today to preside at a meeting of the Cabinet which, despite authoritative disclaimers, bore all the appearances of an emergency session.

Coming on the eve of the Washington talks between Britain and the United States about possible relief from the conditions of the fast-dwindling American loan, the meeting was seen by some to portend an imminent decision on the kind of relief Britain would seek.

Before the Cabinet met it was indicated that only certain Ministers had been called, including Dr. Hugh Dalton, Sir Stafford Cripps and Mr. John Strachey. These head departments most concerned in Britain's urgent crisis—the Treasury, which must find the dollars when the loan runs out in October or earlier; the Board of Trade, which must press through the switch-over of British industry to essential production; and the Food Ministry, which budgets the foreign supplies programme on which Britain depends for more than half its food.

Mr. Strachey has already stated his aim to avoid a reduction in basic rations, and has said that if essential supplies are cut, he will introduce differential rationing between jobs.

As the Ministers assembled, it was learned that there were no plans yet

FAREWELL TO BRITISH TROOPS

Lord Mountbatten speaks to the departing contingent. A side of the "Georgic" forms the background

Peace, Progress & Prosperity

QUAID-E-AZAM GREETS INDIA

GREAT WELCOME GIVEN TO LORD MOUNTBATTEN

One-Day Visit To Bombay

শ্রীহট্টের বিভাজন

ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়

ড. সুজিত ঘোষ

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার ৭৫টি বছর অতিক্রান্ত হলো। আর এই মহালগ্নে সেই উপলক্ষ্যে এখন গোটা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। কিন্তু যখনই স্বাধীনতার কথা আসে, ঠিক তখনই দেশভাগের সেই চরম দুর্ভোগ আর নির্মমতার ক্ষত মনকে অস্থির করে তোলে। দেশবিভাগ, এক কথায় হিমালয়সদৃশ ভুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে দেশবিভাগ ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত, যার পেছনে কাজ করেছিল মূলত মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তথা বাঙ্গালিকে চিরতরে ভারতীয় ভূখণ্ডের বাইরে ফেলে রাখার চক্রান্ত। ১৯৪০ সালে লাহোর কংগ্রেসে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবি জানিয়ে সেই প্রস্তাব পাশ করে, যদিও ১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতে এসে সেই দাবিকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু লুই মাউন্টব্যাটন এই অনৈতিহাসিক পরিকল্পনা রূপায়ণ করেন। ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল মূলত রাজনৈতিক।

আসলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এবং সেই যুদ্ধ হবে ভারতের মাটিতেও। সেই যুদ্ধে ভারত ইংরেজকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলে শর্তস্বরূপ যুদ্ধশেষে ভারত ছেড়ে ইংরেজ পাকিপাকি ভাবে ইংল্যান্ড চলে যাবে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে, এইটি ঠিক হলো। যদিও সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিন থেকে এবং রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুর থেকে সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশে আকুল আহ্বান জানালেন ক্রিপস্ মিশনকে প্রত্যাহার করার জন্য। কিন্তু ক্রিপস সাহেব জওহরলাল নেহরু, রাজাগোপালচারী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, সিতারামাইয়া প্রমুখের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন। নেহরুকে ক্রিপস সাহেব বোঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে জাপানের সাহায্যে যদি আজাদ হিন্দ এগিয়ে আসে তাহলে ভারতের কর্ণধার হবেন সুভাষচন্দ্র বসু। এদিকে জিন্নার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ক্রিপস সাহেব আদায় করেছিলেন পাকিস্তানের লোভ দেখিয়ে। তবে সেই সময়ে গান্ধীজীর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি কিন্তু এই ক্রিপস মিশনকে সমর্থন করেননি, বরং বলেছিলেন ইংরেজরা তাড়াতাড়ি ভারত ছেড়ে যাক। তারপরে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ হবার আর কোনো কারণ থাকবে না। গান্ধীজী ডাক দিলেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। যার অবধারিত ফল ছিল ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। তার পরবর্তী ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়নি।

এটি একটি ঐতিহাসিক প্রহসন যার ফলস্বরূপ ৩ জুন ইংরেজ সরকার দেশবিভাগ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা করে, যা ইতিহাসে '৩ জুন প্ল্যান' নামে খ্যাত। ৯ জুন মুসলিম লিগ এবং ১৫ জুন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং স্থির হয় যে ২০ জুন বাঙ্গলা এবং ২৩ জুন পঞ্জাব প্রদেশটিকে ভাগ করা হবে। কী নির্মম!

দেশবিভাগ নিয়ে কথা বলতে গেলে বহু স্মৃতি আমাদের মনে উঠে আসে। যেমন আজও আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার নয় যে কেন লুই মাউন্টব্যাটেন শ্রীহট্টে গণভোটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কারণ অসম নিয়ে কোনো বিতর্ক বা আলোচনা ছিল না এবং অসম বিধানসভার কোনো সিদ্ধান্তও এক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেন? আসলে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় এই গণভোটের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। এই নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিককে নানারকম মতামত পোষণ করতে দেখা যায়। ৬ ও ৭ জুলাই শ্রীহট্টে গণভোট হয় এবং কোনো কারণ না দেখিয়ে চা-বাগানের ৫ লক্ষ শ্রমিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তথাকথিত বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরাও তখন নীরব থেকে গেলেন। মাত্র ৫৫ হাজার ৫৭৮ ভোটের ব্যাবধানের শ্রীহট্ট পাকিস্তান যাবার ছাড়পত্র পেল। যারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন তাদের বংশধরেরা আজও সেখানে রয়েছেন এবং তাদের চরম দুঃখের কথা তাদের লোকসংগীতে এখনও আমাদের কানে বাজে।

কংগ্রেসের এই নোংরা রাজনীতির সাক্ষী হয়ে রইল ভারতের ইতিহাস। এতে তাদের পরিকল্পনা সফল হলো। তবে এই ঘটনার এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। যাঁরা গবেষণা কার্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের সকলেরই দায়িত্ব এই ঘটনার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সামনে উপস্থাপন করে সত্যটাকে তুলে ধরা। একমাত্র তবেই আমরা স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসব পালনের মাধ্যমে বীর বলিদানীদের প্রতি উন্মুক্ত চিত্তে যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণে ব্রতী হয়েছি তা পূর্ণতা লাভ করবে।

হঠাৎ করে 'বাউন্ডারি কমিশন'-এর গঠনের কারণ ছিল শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিনটি থানাকে ভারতে রাখার প্রস্তুতি। আর এই কমিশনের যে ত্রুটি ছিল সেটাই এখনকার করিমগঞ্জ জেলা। জানলে অবাক হতে হয় যে, গণভোটের জন্য 'শিলং গভর্নমেন্ট প্রেস' যারা জালনোট মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। শুধু ছাপাখানার সুপারিনটেনডেন্টকে বরখাস্ত করা হলো। এটি ছিল ১৯৫৩ সালের ঘটনা। শুধু তাই নয়, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে ভোটার সংখ্যা থেকে ব্যালট পেপার বেশি

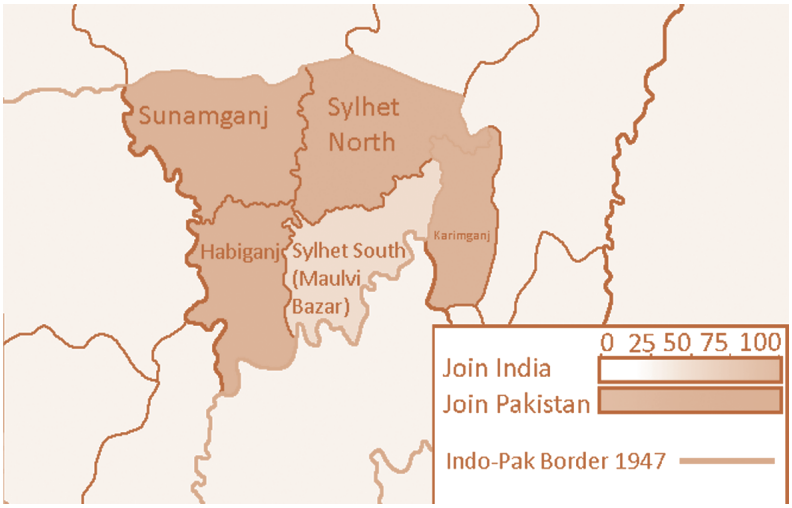

ছাপানো হয়েছিল। প্রতিরোধ করার মতো যে তথাকথিত উদারপন্থী মতাদর্শীরা ছিলেন তাঁরা নিশ্চুপ থেকে গেলেন। তবে তাই বলে থেমে থাকেনি এক ঐতিহাসিক প্রহসনের বিয়োগান্ত পরিণতি, যা আজকের করিমগঞ্জকে ভারতে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপরের ঘটনা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকল। পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবার কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্যামলেশ দাসের 'শ্রীহট্টের গণভোট : ভারত ইতিহাসের কলঙ্ক' শিরোনামে সম্পাদিত বহু তথ্যনির্ভর এবং গবেষণামূলক গ্রন্থটি ইতিহাসের অনেক অন্ধকার অধ্যায় মানুষের সামনে খুলে দিয়েছে। এই গণভোটের যেসব অনৈতিক ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গালি হিন্দু বিরোধী কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হয়েছে তা বর্ণনার অতীত। তাই আগামী প্রজন্মের পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ রইল এই কলঙ্কিত ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনের বারংবার প্রয়াস চালিয়ে এক কালিমা মুক্ত ইতিহাস রচনা করার।

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ছিলেন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁর বিখ্যাত বই 'পাক-ভারতের রূপরেখা'তে তিনি বলেছেন, 'শ্রীহট্টের হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালিরা অসমীয় অধিবাসীদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধি সকল দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব অসমীয় নেতাদের কাছে চিরকালই চক্ষুশূল ছিল। তাই তারা দেশ বিভাগের আগেও সিলেটকে বাঙ্গলার মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। দাবিতে যখন কোনো ফল হলো না, তখন তারা 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন গড়ে তুললেন। এরই চরম পরিণতি ছিল সিলেটের পূর্ববঙ্গভুক্তি। তাই দেশ বিভাগের সময় ঠিক হয়েছিল যে সিলেটের অধিবাসীদের গণভোটে ঠিক হবে যে সিলেট ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে থাকবে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে এতদিন যারা অখণ্ড ভারতের জন্য গান্ধার-পেশোয়ার থেকে সিলেট পর্যন্ত একজাতি-একপ্রাণ-একতার স্বপ্ন দেখে সংগ্রাম করেছিলেন, ওরা সেই স্বপ্নকে খান খান করে দিলেন। ইতিহাস তাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার সম্পাদিত 'Struggle for Freedom' (পৃষ্ঠা-৭৪৫-৫০) বইটিতে খুব সুন্দর ভাবে সিলেট রেফারেন্ডাম বিষয়ে বিশদ ভাবে গণভোটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং শ্রীহট্টের গণভোটের বিয়োগান্ত পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন। একইরকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়, যেখানে তিনি খুব আক্ষেপের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের কূট রাজনীতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক ভাবে শ্রীহট্টের বিভাজনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

'সমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।'

(লেখক চেয়ারম্যান, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট এশিয়ান স্টাডিজ, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার)

কানা ও কালা

দুই বন্ধু। একজন কানা, চোখে দেখতে পায় না। আর একজন কালা, কানে শুনতে পায় না। ওদের কোনো বাঁধাধরা কাজ নেই। কেউ ওদের ভরসা করে কাজ দেয় না। বাধ্য হয়ে ওরা চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

একদিন রাতে ওরা এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে গেল। কালা চোখে দেখে, তাই এটা সেটা দেখে দেখে জিনিসপত্র বের করে পুঁটলি বেঁধে কানাকে দেয় বহন করার জন্য। কানা কোনো শব্দ শুনতে পেলে কালাকে সাবধান করে দেয়। এভাবে দুজনে অনেক জিনিসপত্র চুরি করে এনে জঙ্গলের এক কিনারে বসে ভাগ করতে বসল। জিনিস ভাগ করছিল কালা। সে ভালো ভালো জিনিসগুলো নিজের সামনে রেখে একেবোরে খারাপগুলো কানার সামনে রেখে বলল, 'ভাই কানা, তুমি কোন ভাগটা নেবে বলো?।' কানা খুব সহজভাবে বলল, 'ভাই, আমি তোমার সামনের ভাগটা নেব।' উত্তর শুনে কালা মনে মনে চটে উঠল। কিন্তু রাগটা প্রকাশ না করে ভালো মানুষের মতো বলল, 'কানাভাই, দাঁড়াও, ভাগাভাগিটা মনে হচ্ছে ঠিকমতো হয়নি। আবার করছি।' এই বলে ভালো জিনিসগুলো কানার সামনে রাখল আর খারাপগুলো নিজের সামনে রেখে বলল, 'বলো ভাই, এবার কোন ভাগটা নেবে?' কানা এবারও সহজভাবে বলল, 'ভাই, আমি আমার সামনের ভাগটাই নেব।' কালা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। পাশে রাখা বালির ঢিবি থেকে এক মুঠো বালি নিয়ে কানার চোখে ঘষে দিয়ে বলল, 'বেটা শয়তান, তুই নাকি চোখে দেখতে পাস না।' কানা বালি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ঠিক করল কালার স্বার্থপরতার শাস্তি দিতেই হবে। তারপর কালার দুই কানে দুই থাপ্পড় কষে দিয়ে বলল, কানে তো শুনতে পাস না, কিন্তু নিজের স্বার্থটা তো ষোলোআনা বুঝিস।' এভাবে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করে ঝগড়া থামিয়ে জিনিসগুলো সমানভাবে ভাগ করে চলে যাবার উপক্রম করল।

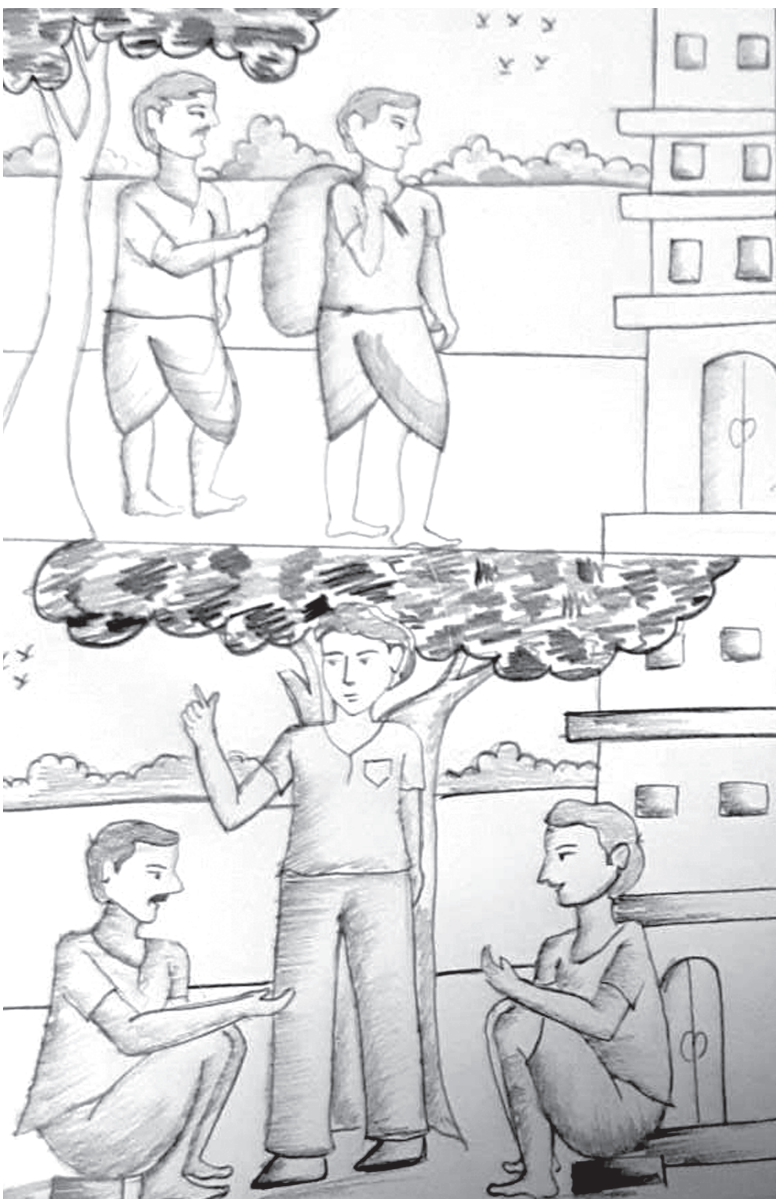

ঠিক তখনই বাড়ির মালিক এসে দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলল। কানা ও কালা দুজনেই মালিকের হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগল। বলল, আমরা নিরুপায় হয়ে চুরি করেছি। আমরা তো কাজ করেই বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু আমরা কালা ও কানা বলে কেউ আমাদের কাজ দেয় না।' মালিক ওদের কথা শুনে খানিক চিন্তা করলেন। ঠিকই তো ওদের কেউ কাজ না দিলে ওরা খাবে কী? তিনি ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন। বললেন, ' আজ থেকে তোমরা আমার বাড়ির পেছনের জমিতে ফসল ফলাবে আর উৎপন্ন ফসল বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে। এর থেকে যা আয় হবে আমরা তিনজনে সমানভাবে ভাগ করে নেব।'

কানা ও কালা কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পেল না। শুধু তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বাঁশরী সিনহা

ভারতের বিপ্লবী

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লবী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের ঢাকার বাঘড়াতে। বাবা শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্র সমাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় যে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়, তাতে অংশগ্রহণ কালে তিনি পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

জানো কি?

- পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ হলো কীর্তন।
- কেলুচরণ মহাপাত্র ওড়িশি নাচে বিশ্ববিখ্যাত।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও সুর দেওয়া গানকে 'রবীন্দ্র সংগীত' নাম দেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক।
- উত্তরবঙ্গের প্রাচীন প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র হলো পাখোয়াজ।
- গিটার ও সেতারকে মিলিয়ে 'মোহনবীণা' তৈরি করেন পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট।
- পুরন্দর দাসকে কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সংগীতের জনক বলা হয়।

ভালো কথা

কুকুরির মাতৃস্নেহ

আমাদের গ্রামের বড়ো অশ্বত্থগাছে একটি মা বাঁদরের বাচ্চা প্রসব হয়েই নীচে কাদায় পড়ে যায়। থপ শব্দ শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি ছানাটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। ওদিকে গাছের ওপর মা বাঁদরটির কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। নীচে একবার তাকিয়েও দেখছে না। আমরা ভাবছিলাম ছানাটার কী হবে। তখনই আমাদের পাড়ার নেড়িটা এসে দৌড়ে ছানাটাকে শুঁকতে লাগল। তারপর মুখে নিয়েই ছুটে গিয়ে ওর সেদিনই হওয়া ছানাদুটোর মধ্যে রেখে দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাঁদরছানাটাও নেড়িটার দুধ খেতে শুরু করল। সাতদিন পরে দেখি নেড়িটার পেটে বাঁদরছানাটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে আর আমাদের দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছে। আবার একই সঙ্গে তিনটে ছানাই মায়ের দুধ খাচ্ছে।

রূপম মাহারা, দ্বাদশ শ্রেণী, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

সবাই থাকে ভালো

নির্মল বর্মন, একাদশ শ্রেণী, মালঞ্চা, দঃ দিনাজপুর।

অবশেষে ধুম বৃষ্টি
কৃষকের আনন্দ
বুক ভরে শ্বাস নেয়
সোঁদা মাটির গন্ধ।
দেরি করে এল বর্ষা
ক্ষতি নেই তাতে
মনের আনন্দে কৃষক
চাষবাসে মাতে।
বর্ষাটা ভালো হলে
গোলা ভরে ধানে
ধানই যে লক্ষ্মীর দান
সবাই তা মানে।
বর্ষাটা ভালো হলে
সবদিকে ভালো
কৃষকের গোলা ভরলে
সবাই থাকে ভালো।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

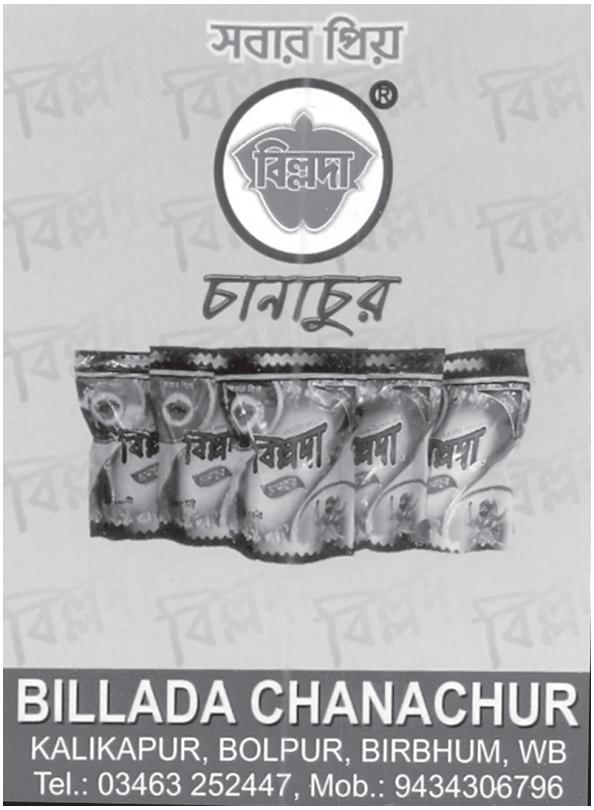

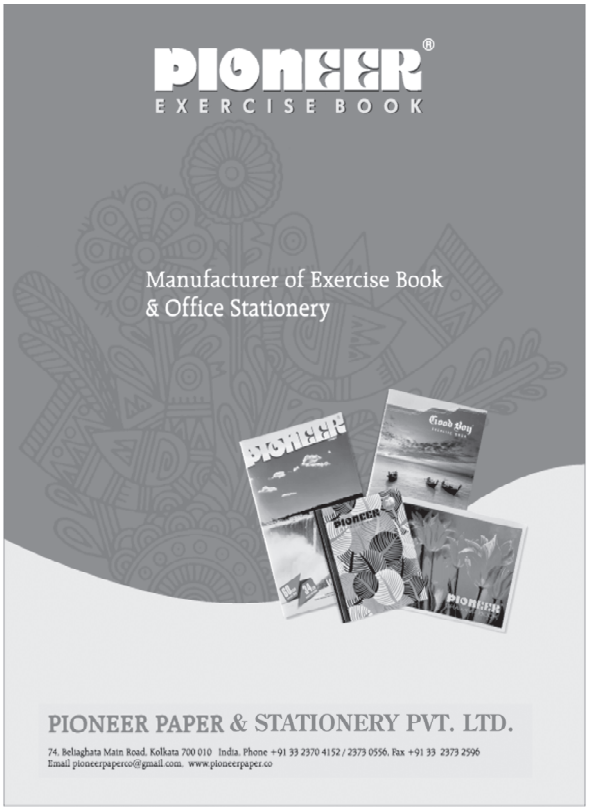

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মতুয়াদের অবদান

রক্তিম দাশ

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে শিক্ষায় উন্নত, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান বাঙ্গলার এক অপ্রতিরোধ্য সামাজিক শক্তিরূপে মতুয়া সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ নিম্নবর্গীয় সমাজকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে ফরিদপুর জেলার সাফালাডাঙায় একটি নমঃশূদ্র কৃষক- পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর, যিনি 'মতুয়া সমাজ' প্রবর্তনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের সমাজের সামনে এক নতুন আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র আন্দোলনকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনরূপে গড়ে তোলেন।

মতুয়া আন্দোলনের সংগ্রামী ধারার শুরু

১৮৩৩ নাগাদ প্রায় একুশ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর স্থানীয় জমিদার ও সমাজপতিদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে জন্মস্থান সাফালাডাঙা ছেড়ে ওড়াকান্দি চলে আসেন। জমিদারদের দরিদ্র কৃষক লুণ্ঠনের ব্যাপারটি তিনি জানতেন। কিন্তু এখানে এসেই তিনি উপলব্ধি করেন জমিদারদের বিলাস বৈভবের রহস্য। মাত্র তিনমাসের খোরাকি দিয়ে এরা গোটা বছর কৃষকের ঘাম ঝরিয়ে নিত। বেগার খাটাতো। এমনকী কেনা-বেচাও করা হতো গরিব চাষিদের। ১৮৪৬ নাগাদ এই দাসব্যবসা বন্ধ করে ফেলা ছিল মতুয়াদের প্রথম বড়ো সাফল্য। 'শাস্তি বিক্রি' নামে একটি অদ্ভুত প্রথা তখন চালু ছিল বাঙ্গলায়। জমিদারেরা খুন-রাহাজানি মামলাতে জড়ালে অন্ত্যজ মানুষদের লোভ কিংবা ভয় দেখিয়ে নিজের কাঁধে দায় নিয়ে বাবুদের বাঁচিয়ে দিতে বাধ্য করা হতো। হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে এই কুপ্রথা বন্ধ হয় এবং সেই সঙ্গে নরবলির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন শুরু হয়। কারণ সেই সময় এই নরবলির শিকার হতেন এই নমঃশূদ্রদের মতো পিছিয়ে পড়া মানুষেরা।

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজের প্রবর্তিত মতকে কখনই হিন্দুধর্ম বহির্ভূত মনে করেননি। তিনি বলতেন, 'মতুয়া দর্শন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম মতবাদ।' তিনি ছিলেন ধর্ম পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। মতুয়ারা হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে মান্য করেন। আবার অনেকে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মহাকাল পরমেশ্বর শিবের অবতার রূপে মনে করেন। এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মতুয়া গোষ্ঠীর কোনোরকম বিরোধ বা এই সমাজ থেকে বেরিয়ে নব্য ধর্ম স্থাপনের অভিপ্রায় কোনোটাই ছিল না। মতুয়াদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। এতে বলা হয়েছে, 'রাম হরি, কৃষ্ণ হরি, হরি গোরাচাঁদ। সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ।'

মতুয়াদের একটি নিশান আছে। এই নিশানের ত্রিকোণ লালবর্ণের পতাকার তিনদিকে সাদা প্রান্তরেখা। লাল অর্থাৎ বিপ্লব বা অগ্রগতির জন্য লাগাতার সংগ্রাম এবং সাদা অর্থাৎ শান্তির প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে সকলের সঙ্গে সম-অধিকারে সহাবস্থানের নীতিতে শান্তির জন্য বিপ্লব। সমাজের অস্পৃশ্যতা, অসাম্য, কুপ্রথা, অমানবিকতা ও মানবীয় ভেদাভেদ দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লব। মতুয়াদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো জয়ডঙ্কা বা ডঙ্কা, কাঁসর ও শিঙা। বিপ্লব ও যুদ্ধজয়ের প্রতীক যেমন মতুয়ার হাতের নিশান যা আসলে বিজয়পতাকাও বটে, তেমন সেই যুদ্ধজয়ের ঘোষণা তথা উন্মাদনাকে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে ধ্বনিত হয় জয়ডঙ্কা, কাঁসর ও শিঙার ধ্বনি। মতুয়া গোঁসাই ও দলপতিদের হাতে থাকে সোয়া হাত দীর্ঘ একটি দণ্ড, যার

> "নমঃশূদ্রদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার এই যে সুসঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস তার প্রতিফলন আমরা দেখি পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন ঘটনায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা আগেও হয়েছে; কিন্তু তা ছিল অধর্মীয় চরিত্রের। জমি নিয়ে বিবাদ অথবা মহিলা সংক্রান্ত সঙ্ঘাত ঘটেছে। কিন্তু ১৯৪০-এর দশক থেকেই অবস্থাটা পালটাতে থাকে। হিন্দু মহাসভার প্রভাবে নমঃশূদ্ররা এবার মুসলমানদের মুখোমুখি হতে শুরু করে আগের মতো শুধুমাত্র নমঃশূদ্র হিসেবে নয়, হিন্দু হিসেবেও।"

নাম 'ছোটা'। এই ছোটা নিয়ে তাঁরা আগে আগে যান এবং ভক্তরা তাঁদের অনুসরণ করে। তাঁরা সাদা রঙে বেষ্টিত লাল নিশান ও গলায় করঙ্গ (নারিকেল) মালা ধারণ করেন।

ধর্মরক্ষার লড়াইয়ে মতুয়ারা

গুরুচাঁদ অনুভব করেন, 'যে জাতির দল নেই/সেই জাতির বল নেই/যে জাতির রাজা নেই/সে জাতি তাজা নেই।' তাঁর আহ্বান ছিল, 'বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও/কার দ্বারে চাও ভিক্ষা।/রাজশক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে/কালে হবে সে পরীক্ষা।' গুরুচাঁদ ঠাকুরের সময়কালে নমঃশূদ্রদের সঙ্গে জেহাদি মুসলমান ও খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্ঘাতের ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। এর মধ্যে অগ্রগণ্য হলো ১৯২৩ সালে পদ্মবিলের কাজিয়া। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়াদের গ্রাম আক্রমণকারী জেহাদি মুসলমানদের হটিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই করেছিল সেদিন নমঃশূদ্ররা। জেহাদিদের লাশে পদ্মবিল ভরে গিয়েছিল। লাশের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে শেষপর্যন্ত লাশগুলো বিলের ঘাসের চাটানের নীচে পুঁতে রাখা হয়। রাতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রবল বৃষ্টির ফলে ঘাস বেড়ে যায়; বিলের জলও দু'তিন হাত বেড়ে যায়। ফলত পরেরদিন পুলিশ এসে ওই মৃতদেহের চিহ্নমাত্র খুঁজে পায়নি (পদ্ম বিলের কাজিয়া : বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব— কালিদাস বৈদ্য, পৃষ্ঠা-৭৬, ৭৭, ৭৮)। জানা যায়, তৎকালীন বাঙ্গলার লাটসাহেব স্বয়ং লিটনসাহেব এই ঘটনার পর্যালোচনা করতে যান। যদিও সরকারি রিপোর্টে এই উল্লেখ নেই। কিন্তু এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে বাঙ্গলা জুড়ে। সেদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সহজেই অনুমান করা যায় যে মুসলমান আর মতুয়াদের মধ্যে সদ্ভাব তো ছিলই না, বরং আপামর হিন্দুদের বিপদে নমঃশূদ্ররাই রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছিল। আবার ১৯৪৭ সালে যখন বরিশালের পিরোজপুরে জেহাদিরা সরস্বতী পুজোয় বাধা দেয়। নমঃশূদ্র সরদাররা সেই পুজো বন্ধ না হতে দিয়ে, বিসর্জন পর্যন্ত গোটা পুজো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অংশে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার এবং ধর্মান্তরকরণে বাধা হয়ে দাঁড়ান গুরুচাঁদ ঠাকুর। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ডাঃ সিএস মিড ওড়াকান্দিতে আসেন মতুয়াদের ধর্মান্তরণ করতে। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে ডাঃ মিডকেই তাঁর অনুগামী বন্ধু বানিয়ে ফেলেন। ধর্মান্তরণ করতে আসা ডাঃ মিড উলটে গুরুচাঁদের দ্বারা প্রভাবিত মতুয়াদের জন্য নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তাঁর সহযোগিতা ও পরামর্শে গুরুচাঁদ ঠাকুর এরপর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করতে সফল হন।

গুরুচাঁদ ঠাকুর ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ সমসময়িক এবং দুজনেই হিন্দুদের খ্রিস্টান ও মুসলমান আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। জানা যায়, দুজনেই দুজনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। একথা অনস্বীকার্য যে মতুয়ারা হিন্দু সমাজের অভিন্ন অঙ্গ। আর তাই পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের প্রতাপ দেখে স্বয়ং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাদের 'মার্শাল জাতি' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। শামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নীতি ছিল, নমঃশূদ্রদের সীমান্ত সুরক্ষার কাজে লাগানো হোক। যেহেতু নমঃশূদ্ররা ছিলেন বাহুবলী, নমঃশূদ্রদের লাঠিকে ভয় পেত শত্রুপক্ষ, তাই তাদের সীমান্তে বসাতে চেয়েছিলেন তিনি। সেজন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের দৌহিত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে সহযোগিতা দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশ সীমান্তের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনায় তৈরি করান 'ঠাকুরনগর।' এখানেই তৈরি হয় মতুয়াদের সদর দপ্তর।

নীল বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন

১৮৫৮ সালে কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৫৯-৬০ সালে নীল বিদ্রোহ হয়। এসময় ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জমিদাররা কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন হরিচাঁদ ঠাকুর। যশোরের চৌগাছায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে। সড়কি, বল্লম, লাঠি নিয়ে জোনাসুরে ডিক সাহেবের নীলকুঠি আক্রমণ করে মতুয়ারা। ঠিক একইভাবে গোপীনাথপুরে নীলকুঠি ধ্বংস করে ওই সব অঞ্চলে নীলচাষ বন্ধ করে দেয় মতুয়ারা।

১৮৭২-১৮৭৬ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অংশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের পক্ষে থাকা অত্যাচারী জমিদার ও তাদের অনুচরদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষকেরা আক্রমণ করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। কমিউনিস্টরা নয়, গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৮৮০ সালে বাঙ্গলার কৃষকদের দুর্দশা ঘোচাতে প্রথম শুরু করেন 'তেভাগা আন্দোলন'। ভাগচাষে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ কৃষকের প্রাপ্য— এই দাবি নিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর টানা ১৯০৯ সাল পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যান। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পরে। ১৯২২ সালের জুন মাসে বরিশালের পিরোজপুরে এক বিশাল কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সর্বপ্রথম আমূল ভূমি সংস্কারের দাবি গৃহীত হয়। ১৯২১ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় সদ্য জেতা দুই নমঃশূদ্র এমএলএ তথা বাঙ্গলার আইন পরিষদের সদস্য ভীষ্মদেব দাস ও নীরদ বিহারী মল্লিক বাঙ্গলার আইন সভায় 'লাঙ্গল যার জমি তার' আইন পাশ করিয়ে জমিদারি প্রথা ভেঙে আমূল সংস্কারের পথ প্রশস্ত করেন।

বিভিন্ন জেলয় ঘুরে নানা ধরনের সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গলায় ইংরেজ ও জমিদারি শাসনে অত্যাচারিত কৃষক সমাজকে জাগাতে চেয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। আর তাই তিনি হয়ে উঠলেন বাঙ্গলার নিপিড়িত নমঃশূদ্র সমাজের রাজা। রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাঁর এই মহান কর্মযজ্ঞ দেখে তৎকলীন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা তাঁদের আন্দোলনে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে আহ্বান জানান। অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতা তাঁকে চিঠি লেখেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন বা বিদেশি দ্রব্য বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে বারবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর উত্তরে বলেন—

'নিপীড়িত জাতি আছে যত বঙ্গদেশে
চিরদিন কাটে দিন দারিদ্র্যর বেশে,
রাষ্ট্রক্ষেত্রে অর্থক্ষেত্রে অধিকার নাই
সব অধিকার নিছে উচ্চবর্ণ ভাই।।
যদি উচ্চবর্ণ আজি তাহাদের চায়
সেই পথে আছে মাত্র একটি উপায়,

দেশে দেশে বলি যারা আজি ঘুরিতেছে
কিছু বাপু বোজা এভাব ধরেছে।।
সুদিনে মোদের যারা করিয়াছে ঘৃণা
আজ কেন আসে তারা কিছু বুঝি না,
স্বার্থরক্ষা এরা সবে জানে ভালো করে
তোমাদের কাছে আসে স্বার্থের খাতিরে।।'

গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালের ১৩ মার্চ তাঁর স্মরণসভা হয় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। সভাপতিত্ব করেন জেসি গুপ্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। খ্রিস্টান পাদরি ডাঃ সি এস মিড গুরুচাঁদ সম্পর্কে লিখেছেন, 'সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মধ্যে তাঁর মতো একজন দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অমিত তেজস্বী মানুষ দেখেননি তিনি।' সুভাষ চন্দ্র বসু গুরুচাঁদ ঠাকুরকে একজন 'মহামানব' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। গান্ধীজী গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'মহান গুরু।'

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঠাকুর পরিবার

ওড়াকান্দির ঠাকুর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই ইতিহাস কোথাও সেভাবে লিখিত নেই। ঠাকুর পরিবারের দুই সদস্য নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রজীবনেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপস্থিতিতে ফরিদপুরের নমশূদ্র সমাজের পক্ষ থেকে নগেন্দ্রনাথ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে নমঃশূদ্র সমাজের কথা তুলে ধরেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি অংশ নেন। তাঁর অনুরোধে নমঃশূদ্র সমাজের প্রখ্যাত লাঠিয়ালরা শোভাযাত্রা সহকারে সম্মেলনে অংশ নেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর সহপাঠী ও সহযোদ্ধা। সরোজিনী নাইডু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নগেন্দ্রনাথের ছোটো ভাই ছিলেন মহেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩০ সলে তিনি গান্ধীজীর ডাকে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে শামিল হন। বাঙ্গলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে দল গঠিত হয়েছিল তর সদস্য ছিলেন মহেন্দ্রনাথ। এর জন্য তিনি কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছ' মাস দমদম জেল ছিলেন। (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নমঃশূদ্র সমজ : নির্মলেন্দু শাখারু; বাংলার নমশূদ্র, পৃষ্ঠা-১৭৩, ১৭৪, ১৭৫)

মতুয়াদের বাঙ্গলার আইনসভায় প্রবেশ

গুরুচাঁদ বলতেন, 'রাজনীতি হলো জগতের শ্রেষ্ঠ নীতি; কারও ব্যক্তিগত বা কোনো দলীয় নীতি নয়। যে নীতির দ্বারা জাগতিক সব কিছুর উপর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মনুষ্যজাতি সুন্দর হতে সুন্দরতর হতে পারে তাই হলো 'রাজনীতি'। তাঁর কথায় 'শক্তি না দেখিলে কেহ করে না সম্মান। শক্তিমান হতে সবে হও যত্নবান।।' তিনি মনে করতেন, এই শক্তি হলো আত্মশক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। তাই তিনি তাঁর অনুগামীদের বললেন, 'আইন সভায় যাও, আমি বলি রাজা হও। ঘুচাও এ জাতির মনের ব্যথা।'

১৯১৯ সালে নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয় এবং তাতে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার মেনে নেওয়া হয়। ১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিলের নির্বাচনে জয়ী হন ওড়াকান্দির চণ্ডালজাতির মতুয়া বাবু ভীষ্মদেব দাস। আইন সভার প্রথম অস্পৃশ্য মনোনীত সদস্য হবার পরপরই পূর্ববঙ্গের 'বিল' অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশা মোচনের জন্য সরকারের দৃষ্টি বরাবর আর্কষণ করেন। ১৯২২ সালে Bengal Local self act & Bengal Village self Government Act-এ গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্বপ্নপূরণ করতে এমএলএ ভীষ্মদেব দাস বঙ্গীয় আইন সভায় প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি বিভাগে সব পদের জন্য ১৮ শতাংশ ডিপ্রেসড ক্লাসের মানুষের জন্য সংরক্ষণ করার দাবি জানান। গুরুচাঁদের উদ্যোগের ফলেই ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বাঙ্গলা থেকে ৩২ জন প্রতিনিধি নানা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর থেকে নির্বাচিত হলেন। তাঁর মধ্যে ১২ জনই ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় দলিত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন অনেকে। কংগ্রেস বিরোধিতা করলেও তাদেরই সমর্থনে পূর্ববঙ্গ থেকে আম্বেদকর গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। যেগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বঙ্গীয় আঞ্চলিক তপশিলি জাতি সংগঠন (বিপিএসসিএফ) স্থাপন করেন। উলটো দিকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর-এর বিরোধী সংগঠন বঙ্গীয় আঞ্চলিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা বিপিডিসিএল গঠন করেন। দুটি সংগঠনই দেশভাগের বিষয়ে একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে। নিজ নিজ সংগ্রামে এই দুটি দলই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কাজ করে গেছে।

নমঃশূদ্রদের মধ্যে হিন্দুত্বের প্রভাব

নমঃশূদ্র জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার পেছনে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলির প্রচেষ্টাও ছিল। যেমন হিন্দু মিশন ত্রিশের দশক থেকে এই ধরনের মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করে এবং ১৯৩৮-এর পর তাদের কার্যগতি আরও বেড়ে যায় এসে। এই সময় থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রণবানন্দজী যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার নমঃশূদ্রদের মধ্যে কাজ শুরু করেন, যাতে তাদের সংগঠিত করে হিন্দু সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভা। এই সংগঠন ১৯৩৯-৪০ সাল থেকেই তপশিলি জাতিভুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায় এদের ৬৫টি, ঢাকায় ৫০টি, ফরিদপুরে ৪৩টি, যশোরে ২৯টি এবং খুলনায় ৩১টি গ্রামীণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্য নমঃশূদ্র এলাকায় যে সব অঞ্চলে এই শাখাগুলি খোলা হয়েছিল তার অনেকগুলি ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ঢাকা নমঃশূদ্র সমিতির মতো সংগঠনও এই সময় মহাসভার সভাধিপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

নমঃশূদ্রদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে

তোলার এই যে সুসঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস তার প্রতিফলন আমরা দেখি পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন ঘটনায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা আগেও হয়েছে; কিন্তু তা ছিল অধর্মীয় চরিত্রের। জমি নিয়ে বিবাদ অথবা মহিলা সংক্রান্ত সঙ্ঘাত ঘটেছে। কিন্তু ১৯৪০-এর দশক থেকেই অবস্থাটা পালটাতে থাকে। হিন্দু মহাসভার প্রভাবে নমঃশূদ্ররা এবার মুসলমানদের মুখোমুখি হতে শুরু করে আগের মতো শুধুমাত্র নমঃশূদ্র হিসেবে নয়, হিন্দু হিসেবেও।

এই নতুন মনোভাব পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে ১৯৪১-এর ১৮-২১ মার্চের ঢাকা হত্যাকাণ্ডের পর থেকে। কারণ রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার এই নতুন জঙ্গি মনোভাব নমঃশূদ্রদেরও সমানভাবে প্রভাবিত করে। ঢাকা ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪১-এর ২০ মার্চ খুলনা জেলায় আরেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে, যাতে একটি হিন্দু নমঃশূদ্র গ্রাম এবং একটি মুসলমান গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই দাঙ্গাটি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি; কিন্তু ঠিক এই সময়ে যে কাণ্ডটি ঘটেছিল তা মনে করায় যে, নিছক জমি বা গোরু-ছাগল নিয়ে বিবাদ এর কারণ ছিল না। এই সময় থেকেই হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবীরা এই অঞ্চলে তাদের সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, আর তার ফলস্বরূপই স্থানীয় নমঃশূদ্র এবং মুসলমানরা বাগেরহাটে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন সরাসরি রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান মুখে নিয়ে। একদিকের স্লোগান ছিল, 'হিন্দু শক্তি কী জয়' এবং 'শ্যামাপ্রসাদ জিন্দাবাদ', আর অন্যদিকের 'মুসলমান শক্তি কী জয়' এবং 'শ্যামাপ্রসাদ ধ্বংস হোক।'

১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র কৃষক তাদের হিন্দু আত্মপরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং হিন্দু মহাসভা এই সময়ে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য এক পৃথক রাজ্যের যে দাবি তুলেছিল তার স্বপক্ষেও তাঁরা যথেষ্ট সরব ছিলেন। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যাতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সে রাজ্য যাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার দাবিতে ওই জেলাগুলির বিভিন্ন গ্রামে সংগঠিত হয়েছিল বহু জনসভা, যাতে বিপুল সংখ্যায় নমঃশূদ্র কৃষকরা যোগ দেন। তাঁদের এই মনোভাব তাঁদের নেতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, যিনি একমাত্র সমর্থন জানিয়েছিলেন শরৎ বসু ও বঙ্গীয় মুসলিম লিগের আবুল হাসেম-সুরবার্দি গোষ্ঠী কর্তৃক আনীত 'সার্বভৌম সংযুক্ত বাঙ্গলার প্রস্তাবকে। বঙ্গীয় আইনসভায় বাঙ্গলা ভাগের প্রস্তাবটি ভোটাভুটির জন্য এলে চারজন বাদে আর সব তপশিলি জাতির সাংসদই ভোট দেন কংগ্রেস-মহাসভার পরিকল্পনার স্বপক্ষে, যাতে ছিল পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে গঠন করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে থাকা সংগঠন বিপিডিসিএল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ দেশভাগের দাবিতে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য হিন্দু মহাসভার সঙ্গে এটি যুক্ত হয়। কলকাতা ও নোয়াখালির ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড পূর্ববঙ্গের তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের মনে আশঙ্কার মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এরা ইসলামপন্থী পাকিস্তানে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিল। তাঁদের পাকিস্তান-বিরোধী তীব্র বিদ্বেষ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ছিল। কারণ ১৯৪৬ সালের দুটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষেরাই। তাঁদের পরিবার জীবন ও জীবিকা এবং সম্পত্তির উপর ইসলামপন্থীরা আক্রমণ করেছিল। পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অংশ থেকে প্রকাশিত 'অনন্ত বিজয় পত্রিকা' প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮ (বাংলা সন) পৃষ্ঠা-১৩৭-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। যার শিরোনাম ছিল 'মতুয়া মহাসঙ্ঘাধিপতির ফরিদপুর জেলা পরিভ্রমণ ও প্রচার কার্য।' এতে বলা হয়েছিল, 'বিগত ৭ ও ৮ জ্যৈষ্ঠে ফরিদপুর জেলার ধর্মরায়ের বাড়ির গ্রামে ষষ্ঠী চরণ ও মুকুন্দলাল সরকারের বাড়িতে মতুয়া মহাসঙ্ঘাধিপতি (প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর) এক বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। উৎসবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে অন্যূন পাঁচ হাজার হিন্দু সমবেত হয়েছিল। এই মহোৎসবে সমবেত জনমণ্ডলকে লক্ষ্য করে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর বলেন, 'আজ পৃথিবীবাসী নর-নারী এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবাসী হিন্দু আজ মৃতপ্রায়। শহর অঞ্চলে কিছু কম হইলেও পল্লী অঞ্চলে হিন্দুর মধ্যে আজিও অশেষ প্রকারের ভেদাভেদ বর্তমান রহিয়াছে। রাজনীতিক কারণেও হিন্দুর মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। আজ হিন্দুদের মনে রাখিতে হইবে, রাজনীতি অপরের সহিত চলিতে পারে নিজের ঘরে রাজনীতিক চালবাজির চেয়ে আত্মাঘাতী নীতি আর নেই। আজ প্রত্যেক হিন্দুর প্রত্যেক হিন্দুকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেই হইবে। হিন্দুর যে কোনও অঙ্গ যে কোনও ভাবে আক্রান্ত হউক না কেন, সমস্ত হিন্দুর একযোগে সেই স্থানে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। যাহার অর্থ আছে সে দিবে অর্থ, যাহার শক্তি আছে সে প্রয়োগ করবে শক্তি। একসঙ্গে বুদ্ধি ও শক্তির অজেয় মন্ত্রে আমরা বিরাট পৃথিবীতে নিজদিগকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিব। আজ কিছু কিছু শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মহাপ্রাণ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, স্যার মন্মথ মুখার্জি, অমিত তেজা বীর সাভারকার প্রমুখ নেতার উদার আদর্শ ও প্রেরণায় আজ হিন্দু জীবনে এক নব যুগের উন্মেষ দেখা দিতেছে। আসুন, আমরা এই সমস্ত মহাত্মাদের আহ্বানে সাড়া দিই।' (বানান ও ভাষ্য অপরিবর্তিত)

মতুয়া রাজনীতিবিদদের হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়া বড়ো অংশটি আশা করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার পর বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ অধ্যুষিত জেলাগুলো পশ্চিমবঙ্গ চলে যাবে। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমে শরৎ বসু, ফজলুল হকের প্রস্তাবিত 'অখণ্ড বাঙ্গলা'র প্রস্তাবের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে মুসলিম লিগ এবং পাকিস্তানের প্রস্তাবের সমর্থক হয়ে যান। দু' পক্ষই প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রবঞ্চিত হয়ে পঞ্চাশের পূর্বপাকিস্তানের গণহত্যার পরে লিয়াকত আলি খানের মন্ত্রীসভার থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ এবং ভারতে চলে আসেন। কার্যত দু' দেশের তৎকালীন মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেস শাসকরাই বাধ্য করে নমঃশূদ্রদের বড়ো অংশকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে। □

BRITANNIA GLASS CO.

7, Swallow Lane,
Kolkata - 700 001, (W.B.) India
Ph. 0091-33-2210 4275 /
2230 5837 / 4064 5951
E-mail : gautam.ge@gmail.com
britanniaglass@rediffmail.com

বিশেষ আমন্ত্রণ

আগামী শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে বাংলা জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৫ বছরে পদার্পণ করবে। এই অবসরে স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট 'বাংলায় সঙ্ঘ কাজের ইতিহাস' নামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করছে। এই উপলক্ষ্যে আগামী ২০ আগস্ট, শনিবার, কেশব ভবনে একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে গ্রন্থটি উন্মোচন করা হবে।
সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমের গরিমা বৃদ্ধি করবেন। আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

স্থান : কেশব ভবন
৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬
সময় : বিকাল ৫টা

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

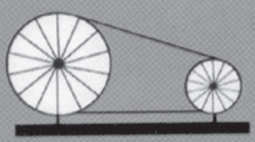

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● **এষা দে** - একটি কাল্পনিক কাহিনি
সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনী

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১১।।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের নাম ও আদর্শ প্রচারের জন্য শ্রীপাদ মহেন্দজী আটজন ব্রহ্মচারী নিয়ে সর্বপ্রথম 'মহানাম সম্প্রদায়' গঠন করেন। 'মহানাম' প্রচারে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন কুঞ্জদাসজী।

১৩২৫ সন। রাজেন্দ্রকে সঙ্গী করে আশি মাইল পথ পায়ে হেঁটে ফরিদপুরে বঙ্কিম ছুটে এলেন শ্রীঅঙ্গনে তাঁর প্রভুকে দর্শন করবেন বলে।

(ক্রমশ)